প্রথম সংস্করণ : জ্যৈষ্ঠ. ১৩৬৩
প্রকাশক : গণেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
ন্যাশনাল পাবলিশার্স
১৪৫বি, সাউথ সিঁথি রোড
কলিকাতা—২
মুদ্রাকর : শ্রীসুকুমার চৌধুরী
বাণীশ্রী প্রেস
৮৩বি, বিবেকানন্দ রোড
কলিকাতা—৬
প্রচ্ছদ পরিকল্পনা—শ্রীঅন্নদা মুন্সী
ব্লক ও প্রচ্ছদ মুদ্রণ :
ইণ্ডিয়ান ফটো এনগ্রেভিং কোং প্রাইভেট লিঃ
বেনিয়াটোলা লেন
কলিকাতা।
বিক্রয় কেন্দ্র—পুথিঘর
২২, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট
কলিকাতা—৬

তিন টাকা বারো আনা

মূল কাহিনী ও সংলাপ—প্রবোধকুমার সান্যাল

উপন্যাসে রূপান্তরিত করেছেন—গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য

॥ এক ॥

বড় লাইনের ছোট একটি স্টেশন। যাত্রীর ভিড় মন্দ নয়—সারাদিনে বহু ট্রেন সবেগে গর্জন করতে করতে যেন ছোট্ট এই স্টেশনটিকে উপেক্ষা ক'রেই চলে যায়—অবহেলিত এই গ্রাম্য স্টেশনটির দিকে ফিরেও চায় না। তাই যখন প্যাসেঞ্জার ট্রেন এসে দাঁড়ায় তখন স্টেশনমাষ্টার মশাই কোট গায়ে বেরিয়ে আসেন গার্ডের সঙ্গে দেখা করতে। আর আসে যাত্রী—মেয়ে, পুরুষ। সকাল-বিকেল দু-খানা আপ ট্রেন আর দু-খানা ডাউন। কাজেই প্যাসেঞ্জার মন্দ জোটে না। যাত্রীদের কল্যাণে একটি চা সিগারেটের স্টলও গজিয়ে উঠেছে।

বিকেলের তির্যক আলোতে মোরাস ছড়ানো প্লাটফর্মে এখানে ওখানে গাছের ছায়া পড়েছে। সেই ছায়াকে ঘিরে যাত্রীদের জটলা। হঠাৎ সবাই চঞ্চল হয়ে উঠল। গাড়ি এসে পড়েছে—ট্রেন আসছে। গাড়িখানা আসছে কলকাতা থেকে—খুব বেশী দূর এর দৌড় নয়।

গাড়ি থামতেই একটি বর্ষিয়সী স্ত্রীলোকের বাঁ হাত ধরে মেয়ে কামরার সামনে এসে দাঁড়ালো অল্পবয়সী একটি সুশ্রী মেয়ে। এ কামরা

থেকে কেউ নামলো না। অতএব তরুণীটি পাদানিতে উঠে দরজাটা খুলে ফেল্‌ল। বর্ষিয়সীটি নীচেই দাঁড়িয়ে রয়েছেন, তাঁর ডান হাতখানি কাপড়ের মধ্যে ঢাকা। মেয়েটি আবার নেমে এসে বললে —ও মা, তুমি কি এখনেই দাঁড়িয়ে থাকবে রাঙাদি? নাও ওঠো।

ব'লে মেয়েটি রাঙাদির হাত খানি গাড়ির হাতলে ধরিয়ে দিল;

রাঙাদি বললেন, গোপাল গোপাল।

পিছন থেকে কলকণ্ঠে তরুনীটি হেসে উঠল—নাও, এখন ওঠো। গাড়ি ছেড়ে দিল বলে। আঃ, ওঠো না তাড়াতাড়ি। তোমার গোপালের জন্যে আজ বুঝি আমাকে ইস্টিশানেই পড়ে থাকতে হয়। ওঠো—

বলতে বল্‌তে ব্যস্তভাবে মেয়েটি রাঙাদিকে ঠেলে উপরে তুলে দিল, তারপর নিজেও উঠে পড়ল। ততক্ষণে রাঙাদি কামরার চারিদিকে চোখ বুলিয়ে শঙ্কিত হয়ে প্রায় আর্তকণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠলেন —বলি অ তরু!

মেয়েটি হাসিখুশি মুখখানি তুলে বললে—বলো না, আমি ত কালা নই, ঠিক শুনতে পাবো।

রাঙাদি মাথা নেড়ে বল্‌লেন—গোপাল, গোপাল! নাঃ, এ ভালো হ'ল না। এ যে একেবার ফাঁকা গাড়ি। দরকার নেই, চল বাছা নেমে যাই। গোপাল, গোপাল —

চৈত্রের বিকেলের খুশি যেন মেয়েটির চোখে মুখে, সারা দেহে ছড়িয়ে পড়েছে। হাল্কা গলায় লঘু কণ্ঠে সে বল্‌লে—একলা আবার কোথায়! তুমি আছো, আমি আছি, আর তোমার গোপালও রয়েছে—বলি, আরও কাউকে চাও নাকি রাঙাদি?

বর্ষিয়সী অপ্রসন্ন, কিছুটা বা ভীতও। তরুবালার লঘু চপলতায় তাঁর মনের শঙ্কা কমলো না, বরং আরও যেন বেড়ে গেল। ব্যস্ত ভাবে বললেন— মরণ আমার! রঙ্গ রস সব সময় কি ভালো লাগে? নে চল্, নেমে ভেন্ন গাড়িতে যাই, বাপু।

তাঁর কথা শেষ হবার আগেই গাড়ি ছাড়ার বাঁশী বাজল মাননীয় অতিথি বিদায়ের মতো ট্রেন খানা ধীরে গতিতে চল্‌তে শুরু করল।

রাঙাদির মুখে সহসা উদ্বেগের চেহারা দেখে তরুবালার মুখে ফোটে কৌতুকের হাসি। পরক্ষণেই রাঙাদি ব্যগ্রভাবে বল্‌লেন— তুমি শেকল টানো বাপু, গাড়ি থামিয়ে নেমে চলো অন্য গাড়িতে। এ গাড়িতে পুরুষ বল্‌তে কেউ নেই। যা দিন কাল পড়েছে। না, না, এ ভালো নয়। আমার ভয় করছে।

তরুবালা সকৌতুকে বল্‌লে—এ কি তোমার কলকাতার ট্রাম বাস পেয়েছো রাঙাদি? বাঁধো বল্‌লেই রুখে দিল আর তুমি গোপালকে নিয়ে নেমে গেলে! মিথ্যে মিথ্যে শেকলটি টানলেই পঞ্চাশটি টাকা জরিমানা আদায় করে নেবে। কি, টানবে শেকল?

রাঙাদি মনে মনে কি ভাবলেন, তারপর বল্‌লেন—তোমার বুকে ত ভয়ডর নেই, দড়িছেঁড়া গরু কি না! খাঁ খাঁ করছে এমন গাড়ি দেখে তুমি উঠলে কেন? গোপাল, গোপাল—

তরু হেসেই আছে, সর্বক্ষণ ওর মুখে হাসি। বল্‌লে— গোপালই তোমাকে পাগল করেছে। নইলে এমন সুন্দর ফাঁকা গাড়িতে তোমার ভয়! আমার ত বেশ লাগছে— কেমন ভেতরে কেউ নেই! আঃ—

ব'লে আরামের একটা নিশ্বাস ফেলল তরুবালা।

রাঙাদি ঠোঁট বাঁকিয়ে বিচিত্র ভঙ্গী করেন। তরুবালার মুখের দিকে তাকিয়ে বুঝতে চেষ্টা করেন ওর মনের ভাব—এদিকে আঁচলের তলায় ডান হাত তাঁর ঠিকই ঢাকা রয়েছে।

তরুবালা খোলা জানালা দিয়ে বাইরের পড়ন্ত আলো ছড়ানো প্রান্তরের দিকে তাকিয়ে থাকে। ওর মুখের ওপর আলোর আভা এসে লেগে যেন রহস্যময় করে তুলেছে মুখখানিকে। রাঙাদি সেদিকে তাকিয়ে এক সময়ে বলে ওঠেন—বলি অ তরু—

মুখ ফিরিয়ে তাকালো তরুবালা—ওর ডাগর চোখে কৌতুক।

রাঙাদি বললেন, গাড়ি এবার থামলেই নামবো, বুঝলে? তোমাকে বাপু ঠিক জায়গায় পৌঁছে না দিলে আমার ছুটি নেই—! এখন গোপালের দয়ায়—

রাঙাদির কথা শেষ হবার আগেই মাঝ পথে বন্ধ হয়ে গেল হঠাৎ। দেখলেন, তরুবালা গাড়ির দরজাটা খুলে ফেলেছে—ওর একখানা হাত বাঙ্কের ওপর আর এক হাতে দরজার পাল্লাটা ধরা। চিৎকার ক'রে উঠলেন রাঙাদি-হাঁ-হাঁ-হাঁ! কী সব্বনেশে কাণ্ড! ওরে মরবি, মরবি তুই তরু? ও কি হচ্ছে? বলি পড়ে যাবার ভয় নেই? দরজা খোলার কি দরকার পড়ল—এ্যাঁ?

তরুবালা বেশ শান্ত ভাবেই মুখ ঘুরিয়ে জবাব দিল—গাড়ি কিন্তু তেমন জোরে ছুটছে না, রাঙাদি। প্যাসেঞ্জার ট্রেন কিনা, দিব্যি লাফিয়ে পড়া যায়।

—কি সব্বনেশে কথা। বলি লাফিয়ে পড়ার কথা কেন? না

বাপু, তুমি এখেনে এসে থির হয়ে বসো। আমার বুক ধড়ফড় করছে তোর কথা শুনে।

তরুবালার নড়বার কোনো লক্ষণ দেখা যায় না। মুখ ফিরিয়ে ও বাইরের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

রাঙাদি আবার বকতে শুরু করেন—তোকে বিশ্বাস নেই তরুবালা তুই পারিস—সব পারিস। আমি জানতাম এমনি করে আমাকে দগ্ধে মারবি। আয় এদিকে, আয়।

তরুবালা এবার ফিরে দাঁড়োলো। ওর মুখের হাসি কোথায় লুকিয়ে গেছে। গম্ভীর ভাবে বল্‌লে—(আমার যা খুশি তাই করবো।) নেহাৎ আস্তে চল্‌ছে গাড়িখানা, লাফিয়ে পড়লে বড় জোর হাত পা ভাঙবে, তার বেশি কিছু হবে না, তাই—নইলে—

রাঙাদি আঁৎকে উঠলেন ভয়ে, হয়তো মনে মনে গোপাল ঠাকুরের দোহাইও পাড়লেন। মুখে শুধু বল্‌লেন—আমার ঘাট হয়েছে! আচ্ছা বেপরোয়া মেয়ে ত তুই! মরণ বাঁচন নিয়ে খেলবি জানলে কি আর এই বোঝা ঘাড়ে নিতাম? উঃ কী রাগ মেয়ের—একবারে জ্ঞানগম্যি সব খুইয়ে বসে আছিস। গোপাল, গোপাল—।

তরুবালা খানিকটা এগিয়ে আসে কোমরে হাত দিয়ে। রাগে ওর মুখখানা রাঙা দেখাচ্ছে। রাঙাদির সামনে দাঁড়িয়ে হাত নেড়ে, চোখ ঘুরিয়ে বল্‌লে—কে ডেকেছিল তোমাকে সঙ্গে আসবার জন্যে? আমি একাই পারতুম যেতে! পথঘাট কি আমি চিনি নে! কেনই বা তুমি এলে আমার সঙ্গে।

রাঙাদি চিবিয়ে চিবিয়ে বল্‌লেন—সঙ্গে এলুম খুব অন্যায় করলুম না! একালের মেয়ে তুমি, পথঘাট একটু বেশিই চেনো তা কি আর

জানিনে। তা বলে ভেবো না যে, একা ছেড়ে দেবো! তোমার পিসিমাকে আমি কথা দিই নি?

—তা কথা দেবার জন্যে অত মাথাব্যথা কিসের তোমার। তুমি ত পাড়াপড়শী রাঙাদি! আমি কচি খুকীটি নই, মামার বাড়ির রাস্তাও আমার অচেনা নয়। একা-একা বেশ যেতে পারি।

—চিন্‌তে তোমার কিছু বাকী নেই ভাই, লেখাপড়া শিখেছ, পাঁচটা থিয়েটার বায়েস্কোপ দেখেচো। বুঝলাম অনেক ভাই, দেখলামও কম নয়। তবে এও বলি, যতোই চিনে থাকো এখনো নিজেকে ত চিন্‌তে পারো নি। গোপাল, গোপাল—।

রীতিমত জোর গলায় তরুবালা বল্‌লে—থাক্, আর উপদেশে কাজ নেই, ওতে আমার অরুচি। উঠতে বসতে মা-পিসিমা দুবেলা বিশুদ্ধ উপদেশের রেকর্ড শুনিয়ে কান দুটো ঝালাপালা ক'রে রেখেছে। আবার তুমিও শুরু করলে! আচ্ছা রাঙাদি আমি কি করি বলো তো?

বল্‌তে বল্‌তে কতকটা শ্রান্ত হয়েই তরুবালা বেঞ্চের ওপর বসে পড়ল। রাঙাদি ওর দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকালেন।

তরুবালা আপন মনেই বলে উঠল—আচ্ছা, আমি ত একটা মানুষ! আমার ইচ্ছে—অনিচ্ছে কিচ্ছু থাকতে নেই? সকলের খেয়ালের খেলা—কলের পুতুল—না কী আমি?

রাঙাদি ওর কথার স্রোতে আর সব ভুলে গিয়েছেন। ক্ষণিকের জন্য বোধহয় গোপালের নাম স্মরণ করার কথাও আর মনে ছিল না। অস্ফুট কণ্ঠে তরুবালার শেষ কথাটির পুনরাবৃত্তি করেন—কলের পুতুল!

এদিকে গাড়ির গতি মন্থর হয়ে আসে। বাইরের গাছপালাগুলো এখন আর চোখের সামনে দিয়ে ছুটে পালাচ্ছে না। দূরে-অদূরে ঘরবাড়ি দেখা যাচ্ছে। রাঙাদি হঠাৎ চম্‌কে উঠ্‌লেন—কি রে, গাড়ি থামালো বুঝি! নে, নে, ওঠ বাছা। নেমে চলো বাপু অন্য গাড়িতে। এই একলা কামরায় আর নয়।

তরুবালার ওঠবার কোনো লক্ষণ দেখা যায় না। আপন মনে ও যেন কী ভাবছে।

রাঙাদি তাড়া দিলেন—অ মা, কলের পুতুলের মত বসেই থাকবি? গোপাল, গোপাল—! ধর আমার হাতখানা। ইদিকে আবার বেলা প'ড়ে আসছে। তাড়াতাড়ি চ। গাড়ি ত নয়, আরমানী গোরা, দু দণ্ড থির হয়ে দাঁড়াতেও তর সয় না। গোপাল গোপাল! চল্‌-চল্‌।

বাম হাতের উপর দেহের সবটুকু ভার চাপিয়ে দিয়ে রাঙাদি বেশ অবলীলাক্রমে নেমে এলেন। তরু তাঁর পিছনে পিছনে নামলো। এবার আর তরুবালার সহায়তার অপেক্ষা রাখছেন না রাঙাদি। প্রায় ছুটতে ছুটতে একখানা কামরার মুখে এসে দাঁড়ালেন। এ গাড়িতে অনেক লোক উঠ্‌ছে। অতএব আর ভাবনা নেই নির্জনতার। তিনি আবার বাঁ-হাতের জোরেই গাড়িতে উঠে পড়লেন। দরজার মুখে আরও অনেক যাত্রী তখনও ওঠার জন্যে ঠেলাঠেলি করছে।

এ স্টেশনেও গাড়ির স্থিতি অল্পক্ষণের। গার্ডের বাঁশী, ইঞ্জিনের বাঁশী সব বেজে গেল। তরুবালা তখনও ভেতরে ঢুকতে পারে নি। তেমন ব্যস্ততাও নেই ওর। একটু একটু করে ট্রেন চল্‌তে শুরু

করে দিল। কামরার ভেতরে রাঙাদি একটা আসন দখল ক'রে বসে, হঠাৎ আবিষ্কার করলেন, তরুবালা নেই।

তিনি চেঁচিয়ে উঠ্‌লেন—কই, কই, উঠ্‌লিনে—ওরে সব্বনাশী! গাড়ি যে ছেড়ে দিল!

তরুবালার সকৌতুক হাসি! দুরন্ত যৌবনের প্রাণ-প্রাচুর্যে উচ্ছল কণ্ঠের উচ্চেরোলে তরুবালা যেন গাড়িখানার সমস্ত যাত্রীকে উচ্চকিত ক'রে দিয়ে বল্‌লে—যদি না উঠে. এবার?

রাঙাদি সত্যিই ভয় পেয়েছেন। তিনি হাউমাউ ক'রে উঠ্‌লেন—দোহাই, দোহাই তোর!...মান রক্ষে করো মধুসূদন...নারায়ণ... ওঠ্ শীগগির ওঠ্! আর জ্বালাস্‌নে—

তরুবালা হাসিমুখে উঠে এসে রাঙাদির গা-ঘেষে বসে বল্‌লে—খুব ভয় পেয়েছিলে রাঙাদি!

—হয়েছে আর রঙ্গ করতে হবে না। গোপাল, গোপাল! এই মেয়ে কি না কলের পুতুল! আমি বলি অন্য কথা। তোর কলে কতো পুতুল তৈরী হবে বেঁচে থাকলে দেখে যাবো। অই আখো, ইতিউতি কি দেখচিস—থির হয়ে বস না বাপু!

তরুবালা বেশ সরাসরি প্রতিটি যাত্রীর মুখের দিকে তাকিয়ে দেখে নিচ্ছে। রাঙাদির কথাটা কানে যেতে একটু ফিক্ ক'রে হেসে বল্‌লে—বারে, তুমি ত বেশ মজার মানুষ! ফাঁকা গাড়িতে হাঁপিয়ে ওঠো, মানুষের মুখে দেখতে পাচ্ছ না ব'লে। আবার মানুষ ভর্ত্তি গাড়িতে উঠে এখন বল্‌ছ চোখ বুজে বসে থাকতে! তবে কেন এখানে মরতে এলে?

যাত্রীদের মধ্যে অনেকেই এই প্রগল্‌ভা মেয়েটিকে দেখে উৎসুক

হয়ে নজর দিচ্ছে। রাঙাদি একটু আড়ষ্ট হয়ে ওঠেন। পাঁচজন যাত্রীর মাঝখানে ব'সে স্ত্রীলোক হয়ে স্ত্রীলোকের লজ্জা সরম সম্বন্ধে উপদেশ দেওয়া চলে না। অথচ এমন এলোমেলো অগোছালো মেয়েকে নিয়ে পথে চলাও বিপদ। রাঙাদি শুধু চুপি চুপি বললেন, বেহায়াপানা ভালো নয়। নে, ভালো হয়ে ব'স।

রাঙাদি বাঁ-হাত দিয়ে তরুর গায়ে চাপ দিলেন, চোখের ইশারায় কী যেন বোঝাতে চাইলেন।

রাঙাদির কাণ্ড দেখে তরুবালা জোরে হেসে উঠ্‌ল। আস্তে আস্তে রাঙাদির কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে বল্‌লে—তুমি ঘোম্‌টা দিয়ে বসো রাঙাদি। অই দাড়িওলা লোকটা তোমাকে কিরকম ক'রে দেখছে—ছাখো।

—আ মরণ! আমি ঘোমটা দিলে ত তোমার ভারি সুবিধে হয় না। গোপাল, গোপাল!

তরুবালার নজর গিয়ে পড়ল ও পাশের বেঞ্চে। একটি যুবক দিব্যি লম্বা হয়ে শুয়ে আছে। ঘুমোচ্ছিল বোধহয় লোকটা। তরুবালার হাসি আর কথার ধাক্কায় তার ঘুমে ব্যাঘাত হয়ে থাকবে হয়তো। তরুর দিকে একবার বিরক্তিভরা দৃষ্টিতে তাকিয়ে যুবকটি মুখ ফিরিয়ে চোখ বুজলো।

তরু আশ্চর্য হয়ে গেল—লোকটার হাতে জ্বলন্ত সিগারেট!

তরুবালা রাঙাদিকে বল্‌লে—হ্যা রাঙাদি, ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে কেউ সিগারেট খায়?

—তোর যতো উদ্ভুট্টি কথা। ঘুমিয়ে আবার সিগারেট খাবে কি করে! থাম বাপু, থির হয়ে ব'স তো। গোপাল, গোপাল!

—অই ছাখো না, ওই লোকটা—

রাঙাদির চোখের দৃষ্টি অপ্রসন্ন হয়ে উঠ্‌ল—গোপাল, গোপাল! কে কি করছে না-করছে তা নিয়ে তোর অতো ইয়ে কিসের লা! বাড়ি থেকে এক-একা বেরুলেই মেয়ে-মানুষের দুর্মতি পেয়ে বসে। গোপাল, গোপাল!

তরুবালা সরল ভাবে প্রশ্ন করে—তুমিও তো মেয়েমানুষ! তাহলে তোমারও দুর্মতি সঙ্গে আছে, বলো?

একথায় রাঙাদি হাসলেন—আমার! হ্যাঁ, তা রয়েছে বইকি। এই যে যাচ্ছি কালভৈরব দর্শনে, গোপাল আমার সঙ্গে থেকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলেছেন। গোপাল, গোপাল!

তরুবালা চুপ ক'রে একথা মেনে নিতে নারাজ। বলে—গোপাল বুঝি তোমার দেবতা?

—তা কেন হবে ভাই। তিনি সবারই—!

—তাই যদি হবে, তাহলে তোমার গোপাল ত আমাকে সুমতি দেয় না?

এরকম স্পষ্ট অভিযোগের জবাব দেওয়া রাঙাদির কাজ নয়। তিনি আপন মনে চোখ বুজে মন্ত্র জপ্‌তে শুরু করলেন।

রাঙাদি চোখ বুজতেই তরুবালার চপল দুটি চোখের চাহনী ঘুরতে ঘুরতে সেই শায়িত যুবকের প্রতি এসে থামলো। তারপর আবার ফিরে এলো রাঙাদির মুখের উপর। তখনও রাঙাদি চোখ বুজে বিজ-বিজ ক'রে ঠোঁট নাড়ছেন।

তরুবালা প্রতিবাদের সুরে বল্‌লে—হয় ঘুমোও, না-হয় চোখ খোলো। কিন্তু বিজ্‌ বিজ ক'র না বাপু। এর চেয়ে ও গাড়িটা

ঢের ভালো ছিল, লোকজন ছিল না—তুমি দিব্যি ড্যাব্-ড্যাব্ ক'রে তাকিয়ে ছিলে! মানুষ দেখে যদি এত লজ্জা ত সেখেন থেকে আসা কেন?

রাঙাদি গলার আওয়াজ নামিয়ে বল্লেন—হাতজোড় করি তরু, একটু মুখে লাগাম দে ভাই। গোপাল, গোপাল!

ওদিকের যুবকটি আবার বিরক্তিমাখা ভ্রূকুটির বান হানলো। তার মুখের ভাবখানা কতকটা, 'আচ্ছা ফ্যাসাদ হ'ল' গোছের। অবশেষে পকেট থেকে একখানা আস্ত রুমাল বার ক'রে সশব্দে সে ছিঁড়ে দু-টুকরো ক'রে দুই-কানে গুঁজে দিল, তারপর মুখখানা ব্যাজার ক'রে পাশ ফিরে শুলো। এসব বাজে কথা সে কানে ঢুক্‌তে দিতে গররাজী।

তরুবালা সবই লক্ষ্য করে। এবার ও নিজের ঠোঁট কামড়ে চুপ ক'রে রইল। গাড়ি চল্‌ছে। বাইরে সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। গাড়ির অল্প আলোতে মানুষগুলোকে কেমন যেন দেখাচ্ছে। রাঙাদি এখনো বিজ্ বিজ্ ক'রে মন্ত্র জপ্‌ছেন, আর মাঝে মাঝে আড়চোখে তরুর দিকে নজর রাখ্‌ছেন।

তরুবালা অন্যমনস্ক হয়ে কি যেন ভাবছিল। হঠাৎ ও লক্ষ্য করে, তরুণ যুবকটির জামাটা দিয়ে যেন ধোঁয়া বেরুচ্ছে। না, সিগারেটের ধোঁয়া ত এমন ঘন হয় না, তা ছাড়া কাপড় পোড়ার গন্ধও নাকে এসে লাগছে! ব্যস্ত ভাবে তরুবালা বেঞ্চের ওপর থেকে ঝুঁকে পড়ে বল্লে—শুনছেন, আঃ, ও মশাই, দেখুন—শুন্‌ছেন—আপনার জামা পুড়ে যাচ্ছে! আগুন—

যুবকটি আড়চোখ নিজের জামার দিকে একবার তাকালো—

তারপর সিগারেটের টুক্‌রোটা তুলে নিল। তরুবালার দিকে সে বারেকের জন্য দৃষ্টিপাত করল না। তার ভাবভঙ্গীতে আশ্চর্য আত্মস্থতা। জামাটা যে পুড়লো তার জন্য বিন্দুমাত্র ব্যস্ততা নেই। সিগারেটের টুক্‌রোটা তুলে নেবার পরও জামার আরও খানিকটা পুড়ে চল্‌ল। অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে রেখেই যুবকটি নিজের পাশ-পকেটটা সাম্‌লাতে চেষ্টা করতে লাগলো।

তরুবালা যেন নতুন একটা মজা পেয়েছে। ভদ্রলোকের বিচিত্র আচরণ দেখে নিজের মনেই হাসলো।

ওকে হাসতে দেখে রাঙাদি মন্ত্রজপ বন্ধ ক'রে বল্‌লেন—আঃ, তোর অত কি দরকার! তুই থাক্ না কেন অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে।

তরুবালা একটু উত্তেজিত ভাবেই জবাব দিল—আঃ পুড়ে যাচ্ছে যে!

রাঙাদি টীকা করলেন—যাক্! যার যাচ্ছে তার যাচ্ছে, তোর জ্বলে-পুড়ে যায় কেন?

এ কথায় তরুবালা আবার একদফা উচ্চহাসির উচ্ছলতায় আধমরা কামরাটাকে চম্‌কে সজাগ ক'রে দিল। বল্‌লে—আমি বাপু পারিনে, হাজার হোক মানুষ ত! চোখের ওপর সব্বনাশ দেখে মুখ ফেরানো আমাকে দিয়ে হবে না! আচ্ছা রাঙাদি?

—কী, বলো।

রাঙাদি শঙ্কিত ভাবে তরুবালার মুখের পানে তাকালেন। মুখরা মেয়েটা আবার কি কথা বল্‌তে কী বলে বসবে কে জানে!

—রাঙাদি, তোমার গোপাল বুঝি বলে যে, মানুষের সর্বনাশ পাছে চোখে দেখতে হয় সেই ভয়ে চোখ বুজে থাকো!

—জানিনে মা। আমি মুখ্যু মানুষ, আমার অতো কথায় কাজ কি! ঠাকুরের পায়ে একটু ঠাঁই যেন পাই এই আমার ধ্যান-জ্ঞান। ঠাকুর বই আর কিছু জানিনে—জানতে চাইনে! কার কি উড়ল পুড়ল তাতে আমার কাজ কী! গোপাল গোপাল—!

তরুবালা এবার দাঁতে দাঁত চেপে জবাব দিল—গোপাল! গোপাল! তুমি যাচ্ছো তোমার ঠাকুরের পায়ে মাথা ঠুকতে—তাই যাও! সেখানে আমাকে কেন টেনে নিয়ে যাওয়া? আমি যাবো না! যাবো না—

রাঙাদির কণ্ঠস্বর মোলায়েম হয়ে গেল হঠাৎ। তরুবালার পিঠে বাঁ হাত বুলোতে বুলোতে মিষ্টি স্বরে তিনি বল্‌লেন · শোনো মেয়ের কথা। ওই ত যাচ্ছি একই পথে। রথ দেখা কলা বেচা দুইই হবে' একটু শান্ত হ দেখি তরু, তুই ত বোকা মেয়ে ন'স ভাই। মায়া' মায়া! ঠাকুরকে কতো করে বলি, গোপাল আমাকে মুক্ত করো, আর কেন। টেনে নাও চরণে।

রাঙাদির কণ্ঠস্বর আবেগের আতিশয্যে রুদ্ধ অশ্রুময় হয়ে ওঠে, তিনি সেই অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বলেন—কতো পাপ যে করিছি ঠাকুর! নইলে, আমার কি এত গরজ, তোর পিছু পিছু চলিছি! না, ওই বলে কে, সেই মায়া! কাটাবো বল্লেই কি কাটে। নইলে আমার কী, দিব্যি ঝাড়া হাত-পা নিয়ে পুণ্যি করতে যেতে পারি ত। জ্বালা ছাড়া আর কি! গোপাল। গোপাল!

তরুবালা কিছু বুঝতে পারে না—রাঙাদির এত দুঃখের কি কারণ থাকতে পারে। না বুঝুক। তাতে এসে যায় না—তবে কারুর দুঃখ কষ্ট দেখলে তরুবালা সহজেই বিচলিত হয়ে পড়ে। তাই রাঙাদির

বেদনাসিক্ত কথার প্রভাবে ওর স্বাভাবিক চপলতা কোথায় অন্তর্হিত হ'ল। মুখখানা গম্ভীর হয়ে গেল তরুবালার। ও আস্তে আস্তে বললে—না, রাঙাদি তুমি কান্নাকাটি ক'র না। তোমার গোপালকে আর কিছু বল্‌ব না, বাপু।

ও পাশে দুই গেরস্থ যাত্রীর মধ্যে তরিতরকারীর দর নিয়ে রীতিমত গবেষণা শুরু হয়ে গেছে। আকবর বাদশা'র আমলে কী সস্তা ছিল আর এখন দেশ স্বাধীন হয়ে ইস্তক কী যে অগ্নিমূল্য হয়ে উঠেছে জিনিষপত্র তারই লম্বা ফিরিস্তি। কিন্তু আলোচনা শেষ হবার আগেই ট্রেনখানা থামলো। আলোচনা থামিয়ে একজন বল্‌লে—এসে গেল! আচ্ছা দাদা চলি। আসবেন না ইদিকে এলে, এই ত পো-টাক পথ, যাকে জিগ্যেস করবেন রঘুনাথ দাস সে-ই বলে দিতে পারবে—হেঁ—হেঁ। পব্‌লিক্ ওয়ার্কের এই একটা সুবিধে। কই রে খন্তা নামা! হ্যাঁ বাবা, একটু মিঠে হাতে নামা—ওরে গাধা, ওটা গুঁড়ের নাগরী! কতো বার বলিছি না, গুড়ের নাগরীতে হাত দেবার অগ্রে মনে করবি, একটু বেচাল বেতাক হয়েছে কি সর্বনাশ! হ্যাঁ-হ্যাঁ-হ্যাঁ!

তরুবালা আর রাঙাদিরও এই ষ্টেশনেই নামতে হবে।

তাদের আগেই যুবকটি ট্রেন থেকে নেমে পড়েছে।

পূর্বোক্ত রঘুনাথ ছিল কাছাকাছি। এগিয়ে এসে পিছন থেকে বেশ জোর গলায় বল্‌লে—এই যে, তুমি আবার এখানে এলে কোত্থেকে—হ্যাঁ! কি মতলব চাঁদ?

যুবকটি এদিক ওদিক তাকিয়ে শুক্‌নো গলায় বলে—আরে রঘু যে, এ দিকে, এই এমনি, মানে কাজ কারবারের ব্যবস্থা আর কি।

যুবকটির দিকে রঘুনাথ যেন একটু সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে তাকায়। অন্ততঃ তার চোখে মোটেই খুশি ফুটে ওঠেনি। ওদিকে আবার খন্তার হাতে গুড়ের নাগরীর কি হাল হ'ল সেটা খোঁজ নিতে সে তৎপর হয়ে পড়ল।

সেই অবসরে যুবকটি যাত্রীর ভিড়ে হারিয়ে গেল। তার হাতে ছিল শুধু মাত্র একটা এ্যাটাচী কেস্।

রাঙাদির বাঁ হাত ধরে তরুবালা প্লাটফর্মের বাইরে এসে এদিক ওদিকে চঞ্চল দৃষ্টিতে তাকাতে লাগলো। রাঙাদি বিষণ্ণ মুখে বললেন —দিনে-দিনে এসে পড়তে পারলেই ভালো হতো! এখন এই রাত বিরেতে পাড়গাঁয়ের পথঘাট! নাঃ, এটা আমার ভালো ঠেকছে না। সঙ্গে একটা বেটাছেলেও নেই—গোপাল, গোপাল—

তরুবালার মুখে দুষ্টু মিষ্টি হাসি ফুটে উঠেছে। বল্‌লে—তা যা বলেছ রাঙাদি, ডাকাতে যদি ধরে তাহলে তোমাকেও ছেড়ে কথা কইবে না!

—আহা, কী কথার ছিরি! তোর বুঝি ভারি সাধ—গোপাল, গোপাল। ও সব অলুক্ষণে কথা ফের মুখে আনবি যদি—

হাসিতে খুশিতে তরুবালা দুলে দুলে ওঠে। ওর এই অস্বাভাবিক হাসিখুশির কল কাকলীতে আশপাশের লোক অবাক হয়ে তাকায়।

—বলি চল বাপু, তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে চল। কালভৈরবের কাছে যাবো, তা বুঝি তোর জন্যে আর হয় না।

রাঙাদির এ কথায় তরুবালা যেন একটু লজ্জা পেল, বল্‌লে —না দিদি, তুমি কেন আমার জন্যে পতিত হবে। তোমার ঠাকুর গোপাল সহায়, ভাবনা কি! আমার না হয় মতিগতির

ঠিক নেই। তাই ব'লে তোমার স্বগে্গর পথে কাঁটা হবো কেন? না, না,—

—নেকৃচার ত খুব দিচ্ছিস্! বলি, গাড়ি টাড়ি দেখতে হবে না কি?

—ওহো, চলো হাটতলার দিকে এগুই, এখেনে ত কিছু নেই দেখছি!

তরুবালা এবার রাঙাদির সঙ্গে হনহন ক'রে এগিয়ে চল্‌লো।

॥ দুই ॥

কালভৈরব নাকি এ অঞ্চলের একচ্ছত্র অধিপতি দেবতা। এ তল্লাটে আর যতো দেব-দেবীর মন্দির আস্তানা সবই বাবা কাল-ভৈরবের অধীনস্থ। অতএব এ হেন কালভৈরব যে সাক্ষাৎ জাগ্রত অবস্থায় মন্দিরে বিরাজ করবেন, তাতে আর সন্দেহ কী! কাল-ভৈরব দর্শনেচ্ছু সমস্ত নরনারীকে এই ছোট্ট স্টেশনে নেমেই রওনা দিতে হয়। স্টেশনের কাছে হাটতলার মর্যাদাও সে কারণেই সামান্য নয়। বিশেষ করে শিবচতুর্দ্দশীর দিন পনেরো আগে থেকে শুরু হয়, জাঁকজমক দিনদিন বেড়েই চলে—এ সময়ে সার্কাশ পার্টি আসে, আসে ম্যাজিকওয়ালা, শহুরে থিয়েটার—গীতাভিনয়ের দল। দোকানে-দোকানে ডে-লাইট্ আর রংদার চটকে চোখে ধাঁধাঁ লাগে। তীর্থের পুণ্য সঞ্চয়ের আনুষঙ্গিক হিসেবে দু-পাঁচটা রং-তামাশা কে আর না দেখে যাবে!

রাঙাদির হাত ধরে চল্‌তে চল্‌তে তরুবালা তার স্বভাবসুলভ কৌতূহলী চাহনীর ক্যামেরাতে হরেক রকম ছবি তুলতে থাকে। এমনি ক'রেই ওরা যখন গাড়ির আড্ডায় গিয়ে পৌঁছলো তখন দুখানি টাঙাগাড়ী যাত্রী ভর্ত্তি ক'রে ঘন্টি বাজিয়ে ওদের পাশ দিয়ে ধুলো

উড়িয়ে বেরিয়ে গেল। তৃতীয় গাড়িখানা এখনো খালি। গাড়োয়ান ঘোড়া সাম্‌লাতে ব্যস্ত—ঘোড়াটি কখনো সামনের পা, কখনো বা পিছনের পা দুটো তুলে লাফাচ্ছে।

রাঙাদি সেদিকে তাকিয়ে সভয়ে বল্‌লেন—গোপাল, গোপাল! ও মা এযে পাগ্‌লা ঘোড়া রে।

তরুবালার ঠোঁটে কথা জুগিয়েই আছে—আহা পক্ষীরাজ! ছাখো না কেমন উড়তে চায়।

ততক্ষণে আরও চার পাঁচজন যাত্রী এসে জমেছে। সকলেই ইতস্ততঃ করছে, এরকম অস্থিরমতি ঘোড়ার হাতে জীবনের ভার-বহনের দায়িত্ব তুলে দিতে ঠিক যেন ভরসা করছে না কেউ। এরই মধ্যে একজন বেপরোয়া গোছের বৃদ্ধ বল্‌লেন—জয় বাবা কাল-ভৈরবের! যা থাকে কপালে—গাড়ি যখন নেই এতেই উঠে পড়ো গো!

বৃদ্ধ একলা নন্‌, তাঁর পিছনে বেশ দশাসই চেহারার 'ওগো' রয়েছেন।

তরুবালাও পরম নিশ্চিন্তভাবে রাঙাদির হাত ধরে টাঙাতে তুলে দিল। ওদিক থেকে বৃদ্ধ সস্ত্রীক উঠে পড়তেই ঘোড়াটা ছুটতে শুরু করলো হঠাৎ। তরুবালার এক পা তখনও মাটিতে—আচম্‌কা গাড়ি ছেড়ে দেওয়াতে ও আর তাল সামলাতে পারলো না। তাকে মাটিতে ফেলে রেখেই ঘোড়াটা দৌড় দিয়েছে।

চলন্ত গাড়ি থেকে রাঙাদি পরিত্রাহি চীৎকার করতে লাগলেন। গাড়োয়ানকে কাকুতি-মিনতি ক'রে বল্‌লেন—ও বাবা, গাড়ি ভেড়াও, আমাদের মেয়ে যে পড়ে রইল গো। অ ভালমানুষের ব্যাটা, থামাও থামাও—

কিন্তু গাড়োয়ান যতই থামাতে চেষ্টা করে ঘোড়াটা যেন ঠিক ততখানি বিক্রম উল্টো দিকে প্রয়োগ করে।

তরুবালা চোট সাম্‌লে দেখল গাড়িব আড্ডায় কেউ নেই। তবে রাস্তার পথ চল্‌তি কৌতুক সন্ধানী লোকেরা ওর এই দুরবস্থা দেখে হাসছে। হাসির শব্দ কানে আস্‌তেই তরুবালা উঠে পড়ে গায়ের ধূলো ঝেড়ে ফেলে আপন মনেই বললে—ঝকমারি, একশোবার ঝকমারি। ওই বুড়ীই যত নষ্টের গোড়া।

রাস্তার ওপরে পাঁচটা লোকজনের সামনে নিজের এই লজ্জায় তরুবালার কান্না এলো।

টাঙাখানা খুব বেশিদূর যায় নি! তরুবালা সেদিকে তাকিয়ে চিৎকার ক'রে বল্‌ল-- ভয় নেই গো রাঙাদি, ভয় নেই—তুমি চলে যাও। আমি ঠিক পৌছবো।

টাঙায় বসে রাঙাদি হায় হায় করেন। তরুবালার কথা ক'টি কানে যেতে তাঁর দু-চোখ ছাপিয়ে জল আসে। এদিকে তোলপাড় চলেছে, ঘোড়ার সঙ্গে যেন লড়াই বেধেছে গাড়োয়ানের। রাঙাদির ডান হাতের ওপর থেকে কাপড় সরে গিয়েছে, তাঁর হাতে পিনাটের ওপর আসীন বিগ্রহ যেন একটু ফাঁকা হাওয়া পাবার জন্য মুখ বাড়িয়ে রয়েছেন। ওপাশের বৃদ্ধ যাত্রীটী ঘাড় বাঁকিয়ে বিগ্রহকে দেখছে।

অসহায় রাঙাদি বুকের ওপর বিগ্রহকে আঁকড়ে ধরে বলেন—তুমি ওকে দেখো ঠাকুর। ।বপদতারণ মধুসূদন মুখ তুলে তাকাও। রাতবিরেতে আইবুড়ো সোমত্ত মেয়েটা যেন বিপাকে না পড়ে! গোপাল, গাড়ি থামিয়ে দাও!

ওদিকে তরুবালা দেখল, টাঙাখানা অন্ধকারে পথের বাঁকে চলে গেল। খানিকটা নিশ্চিন্ত ভাবেই ও নিজেকে বলে—বুড়ি ত গেল, এখন ?

সামনে রাস্তা পেরিয়ে সারি সারি দোকান পসার। তরুবালা আস্তে আস্তে সেই দিকেই যাচ্ছিল, হঠাৎ ওর নজরে পড়ল—সেই যুবকটি। হাঁ, চেহারা এত অল্পক্ষণের মধ্যে ভুলে যাওয়ার মত নয়। যুবকটিকে এড়িয়ে তরুবালা দোকানের সামনে আলোর নীচে গিয়ে দাঁড়ালো।

দোকানী সাগ্রহে প্রশ্ন করল—কি চাই, মা লক্ষ্মী !

তরুবালা ব্যগ্রভাবে বল্‌লে—এর পরে কখন গাড়ি পাবো বল্‌তে পারেন ?

দোকানী প্রশ্ন করে—কোথায় যাবেন, কলকাতা ?

—না, কুলকাঠি।

—কুলকাঠি ? আজ আর কোথায় পাবেন ? আবার সেই কাল সকালে—

—কাল সকালে ? ও ! কিন্তু

কথাগুলো বলবার সময় একটু অপ্রভিত হয়ে পড়ে তরুবালা। এতক্ষণে ওর মনে দুর্ভাবনা দেখা দিয়েছে। রাঙাদি চলে গেল ! একটা কেউ চেনা মানুষ এখানে নেই ! তরুবালা এবার একটু ভীত চক্ষে এদিক ওদিক তাকালো। আলো জ্বলেছে এখানে ওখানে। কিন্তু আলোর আভার বাইরে পল্লীঅঞ্চলের পথ সমস্তটাই অজানা। তরুবালা মুখ ফিরিয়ে একদিকে তাকিয়ে দেখল, সেই যুবকটি আপন মনে এ্যাটাচি কেস্‌ খুলে কী যেন দেখতে ব্যস্ত।

আবার দোকানীর দিকে ফিরে তরুবালা জের টেনে বলে—আচ্ছা, শুনুন!

দোকানী প্রথমে মেয়েটিকে খরিদ্দার ভেবে আশান্বিত হয়েছিল, কিন্তু এখন বেশ বুঝতে পারে যে তরুবালার কাছ থেকে কিছু লভ্য হবে না।

তরুবালার প্রশ্নের জবাবে শুধু নিস্পৃহভাবে তাকালো সে।

তরুবালার সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই, ও আপন মনেই বলে—কুলকাঠি যাবার আর কোন উপায় নেই?

—আছে, হেঁটে যাওয়া যায়!

—কতদূর হবে এখান থেকে?

—পাঁচ ক্রোশ।

—পাঁচ ক্রোশ! পাঁচ ক্রোশ কি এত অন্ধকারে যাওয়া যায়?

দোকানী বললে—গরুর গাড়ি দেখতে পারেন।

—কোনদিকে গরুর গাড়ি পাওয়া যাবে?

—এই যে, ওই দিকে—একটু এগিয়ে গেলেই হাটফিরতি গরুর গাড়ি সব রয়েছে।

রাঙাদির আশায় বহুক্ষণ অপেক্ষা ক'রে রইলো তরুবালা। কিন্তু পাগলা ঘোড়া তাঁকে কতদূর নিয়ে গিয়ে থামলো কে জানে?

এদিকে দোকানীর সঙ্গে কথা বল্‌তে বল্‌তে তরুবালা দেখেছে যে সেই যুবকটি এই দিকেই গিয়েছে। কি যেন ভেবে তরুবালা অন্ধকার পথে নেমে পড়ল। মনে মনে ও যেন যুবকটির ওপর অনেকখানি ভরসা ক'রে বসেছে। কি জানি কেন, তরুবালার ধারণা হয়েছে যে, এই অপরিচিত পরিবেশে যদি কাউকে বিশ্বাস করা চলে ত সে এই

যুবক। আত্মভোলা, উদাসীন মানুষটার সঙ্গে যে তরুবালার আদৌ আলাপ নেই, এসব একেবারেই তার মনে উদয় হয়নি। লোকটা অত্যন্ত উদাসীন বটে, কিন্তু ঘণ্টাকয়েকের মুখ চেনা। সমস্ত অপরিচয়ের মধ্যে একটি চেনামুখ। তরুবালা শুধু বুঝেছে, অন্ধকারে অজানা এই গঞ্জে একটিমাত্র চেনামুখ মাত্র সম্বল—সেও ওই পথে অন্ধকারে মিশে যাচ্ছে। তবে কেন তরুবালা যাবে না ওই অন্ধকারে!

তরুবালা এগিয়ে গেল। কিন্তু ও যদি ব্যস্ত ব্যগ্রভাবে অদৃষ্টের অন্ধকারে নিজেকে সঁপে না দিয়ে, দোকানের আলোর সামনে আর কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতো তাহলে কোনো হাঙ্গামাই হ'ত না—রাঙা-দির সঙ্গে দেখা হয়ে যেত তরুবালার! হ্যাঁ, রাঙাদি বিপদতারণ মধুসূদনের হাতে আইবুড়ো সোমত্ত মেয়ের ভাগ্যের দায়িত্ব তুলে দিয়ে কালভৈরব দর্শনে যেতে পারেন নি। কারণ, মানুষকে তিনি ভালো ক'রেই চেনেন। মন্দ-লোক সব পারে, অন্যায়ের দিকে তাদের লোভ বড় বেশী। ঠাকুর মধুসূদন আর যা-ই করুন, মানুষকে দুষ্কর্ম করার হাত থেকে ঠেকিয়ে রাখতে পারেন না। শাস্তি! সে ও পরিণাম। কিন্তু আনন্দের মজা যে, নগদ বিদায়!......তাই রাঙাদি অতিকষ্টে টাঙা থামিয়ে স্টেশনের পথে একা-একা দ্রুত হেঁটে ফিরেছেন। ডান হাতে তাঁর পিনাটের উপর গোপাল-বিগ্রহ, আর মুখে সেই 'গোপাল! গোপাল!' ডাক।

গাড়ির আড্ডায় তরুবালাকে দেখতে না পেয়ে রাঙাদির শ্রান্ত

চোখে জল এসে পড়লো।—গোপাল, গোপাল! এখন কি করি? কোথায় যাই? কেন মরতে পরের ঝঞ্ঝাট ঘাড়ে নিতে গেলাম। গোপাল, গোপাল। যাই, এখন ইস্টিশানে দেখি।

স্টেশনের দিকে যেতে যেতে রাঙাদির মনে আশা হয় বুঝি বা তরুবালাকে স্টেশনেই পাবেন। হয়তো মেয়েটা অন্ধকারে একা একা মামাবাড়ি যেতে ভয় পেয়েছে, তাই কলকাতার ফিরতি গাড়ি ধ'রে বাড়ি ফেরবার জন্যে স্টেশনে গিয়ে বসে আছে।

ছুটতে ছুটতে রাঙাদি বলেন—মান রেখো গোপাল! ছুঁড়ি যেন ইস্টিশানেই থাকে—হেই বাবা, আর ভুগিয়ো না!

॥ তিন ॥

তরুবালা পথ চল্‌ছে—ওর গা ছম্ ছম্ করছে। কোথায় গরুর গাড়ির আড্ডা কে জানে! একা-একা এইভাবে কতক্ষণ কাটানো চলে? আর গরুর গাড়ি পেলেই কি তরু একলা যেতে ভরসা পাবে? নিজের ওপর ওর একটু রাগ হ'ল। বাস্তবিক, এমন অসমসাহসিক অবস্থায় তাকে একা পড়তে হবে, কে জানত!

খানিক পথ চলবার পর তরুবালা দেখল, আগে আগে সেই চেনা মানুষটি চলেছে। হ্যাঁ, ঠিক সেই লোকটিই বটে—ওই ত হাতে এ্যাটাচি কেসটা দুলছে। ব্যগ্রভাবে তরুলতা এগিয়ে কাছে যেতেই ছোক্‌রা মুখ ফিরিয়ে তাকাল।

হঠাৎ তরুবালা আবিষ্কার করল যে, মানুষটাকে দূর থেকে যতো চেনা জানা মনে হয়েছিল সাম্‌না-সাম্‌নি দাঁড়িয়ে ততই অপরিচিত ঠেক্‌ছে! কেমন একটা দ্বিধা, সংকোচের বাধা ওর সহজ চপলতাকে শৃঙ্খলিত করে ফেল্‌ল।

আড়ষ্ট ভাবে তরুবালা বল্‌লে—শুনুন! একটা কথা—

যুবক ঘাড় ফিরিয়ে দেখল, তারপর ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে জবাব দিল—একটা ত? সে আগেই বুঝেচি!

—আচ্ছা, গরুর গাড়ি কোনখানে পাই বলুন তো?

যুবক বেশ বিদ্রূপমাখা তীক্ষ্ণ কণ্ঠেই বল্‌লে—গরুর গাড়ি? বটে, এই কথা! তা যখন পেছনে লেগেছ, তখনই বুঝেছি। থাক্ আর ওসব বাজে কথায় সময় নষ্ট করার কি দরকার। এদিকে এগিয়ে এসো—

ব'লে সে তাচ্ছিল্যভরে বুক পকেটে হাত ঢুকিয়ে একখানা দশ টাকার নোট বার ক'রে ধরল—ঝামেলা পাকালে বিশেষ স্থবিধে করতে পারবে না, এটা নিয়ে কেটে পড়ো। হুঁ:, এই কারবারে হাত পাকালুম, আজ এসেছ গরুর গাড়ির অছিলা নিয়ে!

তরুবালা সসঙ্কোচে কয়েক পা এগিয়ে এসে আবার পিছিয়ে গেল। ওর চোখে মুখে বিস্ময়ের ছাপ ফুটে উঠেছে, কিছুটা বিরক্তিও সেইসঙ্গে মিশে রয়েছে। বল্‌লে—তার মানে? কি বল্‌ছেন আপনি?

যুবক অধীরভাবে বল্‌লে—আরে নাও ধরো। বলে, পুলিশের চালবাজি ত আর কিছু জানতে বাকী নেই। শালারা মদ্দা গোয়েন্দা লাগিয়ে স্থবিধে করতে পারছে না, তাই তোমার মতো মেয়েকে ছেড়ে দিয়েছে। যাক্ কদ্দিন এ লাইনে চাকরী হ'লো? মাইনে পাও কতো?

তরুবালা অবাক হ'য়ে গিয়েছে—গোয়েন্দা? চাকরী? মাইনে?

যুবক বেশ বিজ্ঞভাবে বল্‌লে—আরে বাবা, তুমিও জানো আমি কে, আর আমিও বুঝে ফেলেছি তুমি কেন পিছু নিয়েছ। মেয়েছেলে তাই খাতিরে দশটাকা দিচ্ছি, সেপাই পেয়াদা হ'লে দু'টাকাতেই কাজ হাসিল হ'ত। যাক্ ধরো, আমার অনেক কাজ রয়েছে।

তরুবালা এবার রীতিমত চটে গিয়েছে। অকারণে এই অচেনা

লোকটা ওকে গায়ে পড়ে অপমান করল! ওর তন্বী দেহ যেন ইস্পাতের মত শক্ত হয়ে উঠেছে। ওর ওষ্ঠে আক্রমণের কঠিন তিক্ততা ফুটে ওঠে—ভদ্রলোকেরা কিন্তু এ ভুল ক'রত না। বিকেল থেকে যাকে দেখছি সে যে একটা চণ্ডাল তা কি ক'রে বুঝবো?

এবার ছোকরা নিজেই এগিয়ে এল তরুবালার সাম্‌নে। তারপর অদ্ভুত অন্তরঙ্গতাব স্বরে ঝুঁকে পড়ে বল্‌লে—ওঃ, তুমি! তাই বলো। কিছু মনে ক'র না ভাই, তোমাকে ঠিক চিন্‌তে পারিনি। আ—চ্ছা, এবার আর বুঝতে বাকী নেই। আবে এসো, এসো তুমি ত মাথার মণি।

যুবকের এই আকস্মিক অন্তরঙ্গতায় তরুবালা সত্যিই ভয় পেয়ে গেছে। লোকটার কথায় যেন নীচতার গন্ধ এসে তরুবালার নাকে লাগে। ও নিজেকে যতদূর সম্ভব অন্ধকারে ঢেকে নিয়ে রুদ্ধকণ্ঠে বলে—তুমি, তুমি কি বল্‌ছ?

যুবক অস্বাভাবিক উচ্চকণ্ঠে হেসে ওঠে।

তরুবালা গ্রাহ্য করে না এই নির্লজ্জ হাসির স্পর্শকে। ও নিজেকে এসবের উর্দ্ধে মনে করে। তাই বল্‌লে - আমি জানতে চাই, গরুর গাড়ির আস্তানাটা কোথায়?

যুবক উচ্চাঙ্গের সবজান্তা হাসি হেসে বলে—হ্যাঁ, সবাই কিছু-না কিছু জানতে চায়, নইলে আলাপ জমে না। তোমার তাহলে মোটর গাড়ি চাই না, সাইকেলও নয়—স্রেফ গরুর গাড়ি, মানে জোড়া-বলদ মার্কা! হুঁ, তা, আমার হাতে সময় খুব কম। এসো তাড়াতাড়ি, দেখি কি করতে পারি।

তরুবালা কিছুটা আশ্বস্ত হয়। তবু অস্বস্তি কাটে না। লোকটা

কেমন যেন হেঁয়ালির সুরে কথা বলে। কিন্তু এই অজানা, অচেনা লোকে কী আর করা যাবে!

সন্দিগ্ধভাবে তরুবালা জিগ্যেস করল—কোথায় যাবো? বড্ড অন্ধকার!

যুবক তাচ্ছিল্যভরে হেসে উঠল—অন্ধকারে ভয় পাচ্ছো! ভবিষ্যৎ যে আরো অন্ধকার! কিন্তু…বড্ড বাজে সময় নষ্ট হচ্ছে। আমাকে যে এক্ষুনি যেতে হবে। হয় চলো, নয়, ছেড়ে দাও আমাকে।

তরুবালা কি আর করবে? সত্যি, যুবকটীকে এ ভাবে ছেড়ে দিয়ে কোথায় কি করবে ও! হাজার হোক, একেবারে অচেনা মানুষ নয়। না, তা নয়। আর সে ত এমন কিছু অন্যায় বলে নি—তরুবালার জন্যে যুবকের অযথা মাথা-ব্যথার কোনো হেতু থাকতে পারে না। তার নিজের কাজ রয়েছে। আর ও যেরকম বেপরোয়া লোক, তাতে স্বচ্ছন্দে তরুবালাকে অন্ধকারে ফেলে রেখে নিজের কাজে চলে যেতে পারে। এই আশঙ্কাটাই যেন তরুবালাকে যুবকের পিছনে পিছনে ঠেলে নিয়ে চল্‌ল।

চল্‌তে চল্‌তে যুবক একবার পিছন ফিরে দেখলওনা তরুবালা তার সঙ্গে আসছে কিনা। সে তরুবালার সমস্যার সঙ্গে নিজেকে জড়াতে নারাজ! এক সময়ে তরুবালার সন্দেহ হয়, বুঝিবা ছোকরা ভেবেছে যে, তরুবালা তাকে রেহাই দিয়ে অন্য উপায়ের সন্ধানে সরে পড়েছে। তার সে ভুল ভেঙে দেবার জন্যে তরুবালা আস্তে আস্তে বল্‌লে—ছুটছো যে, একটু আস্তে চলো না!

—এ পথে আস্তে চলাই বিপদ! এ পথ যে ঢালু, কেউ আস্তে চল্‌তে পারে না।

তরুবালা ঠোঁট কামড়ে প্রাণপণে দ্রুত চল্‌তে চেষ্টা করে।

একসময়ে ওরা একখানা মাটকোঠার সাম্‌নে এসে দাঁড়ালো। তরুবালা থম্‌কে দাঁড়ালো—এ কোথায় আনলে?

—প্রশ্ন ক'র না, ভেতরে এসো।

—কেন? এটা ত গরুর গাড়ির আড্ডা নয়।

—এসো আমার সঙ্গে।

যুবক তাকে যেন ধম্‌কে ওঠে।—

তরুবালা এতক্ষণে বেশ ভয় পেয়েছে। ও বললে—না, যাবো না, আমি স্টেশনে ফিরে যাবো। এ তুমি কোথায় নিয়ে এলে?

যুবকটি এবার তিক্তকণ্ঠে ব'লে উঠল্—নাচতে নেমে ঘোম্‌টা টানলে অবিশ্যি অনেক সময় দর বাড়ে। কিন্তু আমার কাছে এসব ঢঙ দেখিয়ে কিছু লাভ হবে না। গরুর গাড়ির কথা বলেছ আমি সেই মাফিক এনে দিইছি। এখন মিছিমিছি ভোগাচ্ছ কেন?

তরুবালা ঘাব্‌ড়ে গিয়ে আশপাশে তাকালো—এখানে কোথায় গরুর গাড়ি?

বাঁকা হাসি হেসে যুবক জবাব দিল—আছে, আছে। সব সময়ে কি বাইরে থেকে টের পাওয়া যায়? ভেতরে ঢুকতে হয়, তবে ত জানা যায়। আরে ভাই তুমি যা চাও, এই হ'লো তার খাশ মোকাম। একটু ঢুকলেই টের পাবে।

তরুবালার চোখে অবিশ্বাস। নিছক ষোলআনা অবিশ্বাস থাকলে অবশ্য তরুবালা এখান থেকেই উল্টো দিকে উর্ধ্বশ্বাসে ছুটে পালাতো। কিন্তু ওর স্বভাবে আছে কৌতূহলের নেশা। এ হচ্ছে সেই বয়স,

যখন মানুষ পৃথিবীর সব কিছুই দেখতে জানতে চায়। অজানার প্রতি এক দুর্নিবার আকর্ষণ ক্ষণে ক্ষণে তাকে পেয়ে বসে। সে টানের জোয়ারে ভয়, বাধা, আরও অনেক সহজাত সংস্কার আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। তরুবালারও এখন ঠিক সেই অবস্থা। ও জানে না কোথায় কোন্ রহস্যের মধ্যে এই মানুষটি ওকে নিয়ে যেতে উৎসুক। ও জানে যে, এই যুবকের পশ্চাৎপট সম্পূর্ণ অন্ধকার। ও জানে যে, যে অচেনার দিকে ওর টান সে অচেনা-অজানার মধ্যে বিপদ লুকিয়ে থাকতে পারে। সে বিপদ সাংঘাতিক হওয়াও বিচিত্র নয়। তবু তরুবালা পিছন ফিরে স্টেশনের দিকে গেল না, সামনের রহস্যের জোয়ারে নিজেকে এগিয়ে দিল।

তরুবালার ভাবগতিক দেখে যুবক মুচকি হাসে, বলে—গরুর গাড়ি কখনো চড়া অভ্যেস নেই বুঝি? নতুন!

তরুবালা বল্‌লে—শখ ক'রে কি কেউ গরুর গাড়িই চড়ে, না, জামাকাপড় পোড়ায়।

—হুঁ। তাই বলো, যাক্ তক্ককথা রেখে এখন চলো। আমি বুঝিয়ে দিয়ে কাজে যাবো।

যুবকের দিকে তাকিয়ে তরুবালা কি যেন বুঝতে চেষ্টা করে। ওর দিকে যুবকের নজরই নেই, সে স্বচ্ছন্দে ভেতরে ঢুকে পড়ল। তরুবালাও পিছু পিছু চল্‌ল। একটু এগিয়েই তরুবালা দেখতে পেল এক কালিপড়া লণ্ঠন জ্বালানো চায়ের দোকান। ইস্ কী বিশ্রী নোংরা! তরুবালা আঁচল দিয়ে নাক টিপে ধরল। দোকানের সাম্‌নে দাঁড়িয়ে একটি বাচ্ছা ছেলে ফ্যাল্ ফ্যাল্ ক'রে চেয়ে রয়েছে তরুবালার দিকে।

যুবক তার দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করে—কি রে, হ'বে নাকি এক পেয়ালা ?

চক্‌চকে দাঁত বার ক'রে ছেলেটি একগাল হেসে উত্তর দিল—হ্যাঁ! খুব হবে! হাতে-গরম কাট্‌লেটও দিতে পারি।

—আচ্ছা বানা, আসছি।

আবার অন্ধকার। ঝুপ্‌সি ঘন আঁধারে, যুবকের কাপড়ের শুভ্রতাটুকুর দিকে নজর রেখে তরুবালা সাম্‌লে সাম্‌লে চলে। আর থেকে থেকে ভাবে, কোথায় চলেছি!

চল্‌তে চল্‌তে তরুবালার মনে সন্দেহ ঘনিয়ে আসে। ও চম্‌কে উঠ্‌ল, লোকটির উদ্দেশ্য মন্দ নয় ত! নিজের সাহসকে ছাপিয়ে আতঙ্কে যেন আর্তকণ্ঠে বলে উঠ্‌ল—আমি কিন্তু ভদ্রঘরের মেয়ে মনে রেখো।

ভয় যতই থাক্ না কেন তরুবালা, ওর চরিত্রে অপরকে সেটা জান্‌তে দেওয়ার মতো হীনতা নেই। তরুবালার কণ্ঠে তাই আর্তির চেয়ে শাসানীই বড় হয়ে ফুটে ওঠে।

যুবক ঘুরে দাঁড়িয়ে সমঝদারীর সুরে জবাব দিল—ঠিক বলেছ, তা বটে! আচ্ছা, তাই বল্‌বো। দাম বাড়বে!—এসো।

তরুবালা জবাব দেবার আগেই যুবক সাম্‌নের একটা বন্ধ দরজায় টোকা দিল। দরজাটা খুলে একটি লোক বেরিয়ে এল—তার মুখে বিশ্রী হাসি। লোকটিকে দেখে তরুবালা কাঠের মত শক্ত হয়ে গেল। ভয়! জীবনে এত সাংঘাতিক ভয় তরুবালা কখনও পায় নি! ওর বাকশক্তি হারিয়ে গেছে। চোখের সাম্‌নে যা ঘট্‌ছে, যা দেখছে তরুবালা এসব কিছুই বুঝতে পারছে না।

যুবকটি সাধারণ ভাবেই লোকটিকে বল্‌লে—এই নে, মদন। এ কিন্তু ভদ্রঘরের মেয়ে! সস্তায় হবে না, তা বলে রাখছি। এখন নগদ-নগদ মিটিয়ে দাও ভাই।

যন্ত্রচালিতের মত তরুবালা যুবকের সঙ্গে লোকটির পিছু পিছু ধরে ঢুকল। মদনের কাছ থেকে টাকা পেয়ে যুবক যেন একটু হাসলো। তারপর ওদের দুজনের মধ্যে চাপা কণ্ঠে কথাবার্তা চল্‌ল খানিকক্ষণ।

যুবক প্রশ্ন করল—বাণ্ডিলটা কোথায় রে?

—ঠিক আছে। নীচের দোকানে চেয়ে নিস্।

তরুবালা সভয়ে ঘরের এদিক ওদিক তাকায়। ও ঠিক বুঝতে পারে না এদের মতলব কি। আরও একটা আশঙ্কা ওর মনে উঁকি দিচ্ছে, এখন যদি চেঁচামেচি করে ত এই অন্ধকারে কেউ ছুটে আসবে না ওকে বাঁচাবার জন্য। ও আপন মনেই ভাবছে। তরুবালার নিজের অসহায়তা ওকে যেন জড় ক'রে ফেলেছে।

মদন একবার ঘোরালো দৃষ্টি দিয়ে তরুবালার দিকে তাকিয়ে খাটো গলায় যুবককে প্রশ্ন করে - মেয়েটা কেমন রে? বেশ .. হেঁ-হেঁ...চেকন ভাবের মতো...না কি রে, এ্যাঁ!

যুবক ঠোঁট বাঁকিয়ে তাচ্ছিল্যভরে উত্তর দিল -আমি বাবা জাত-ময়রা, চেখে দেখি নে!—মাইরি বল্‌ছি, রূপচাঁদের কথা বলো আছি — কিন্তু চাঁদের রূপ, কি, মেয়েমানুষের রূপ কস্মিনকালে দেখি নে।

মদন বিরক্ত হয়ে বিদায় করল যুবককে—ঠিক আছে, যা, তোর আর কেঠো বুলি আওড়াতে হবে না। মদ্‌না মাষ্টার আমার নাম, পাকা জহুরী, বাবা। তুই যা, আমি এখন সওদা যাচাই করব।

॥ চার ॥

তরুবালা অন্ধকার পথে মিলিয়ে যাওয়ার কয়েক মিনিটের মধ্যেই রাঙাদি তাঁর গোপাল-বিগ্রহকে ডান হাতে নিয়ে হাটতলাতে হাজির হ'লেন। তাঁর চোখে, মুখে ত্রাসের বিবর্ণতা। তাঁর পায়ের গতিতে অস্থিরতার সংশয় ছন্দ। আর মুখে, ভাগ্যদেবতার কাছে আকুল-আকুতির আবেদনবাণী। গোপাল, নারায়ণ, মধুসূদন প্রভৃতি···। রাঙাদি এখন কি করবেন, কোথায় খোঁজ করবেন তরুবালাকে? প্রথমে অনেক আশা নিয়ে হাটতলায় এসেছিলেন,—মেয়েটা নিশ্চয় একা-একা কোঁথাও নড়বে না।··· কিন্তু চারিদিকে তন্ন-তন্ন ক'রে খুঁজেও যখন তরুবালার সাক্ষাৎ পেলেন না তখন নিজের উপর রাগ হ'ল।···কি দরকার ছিল, বড়লোকের মেয়ে রাগ ক'রে একা-একা যাচ্ছে মামাবাড়ি, যেতই। মাঝখান থেকে পরোপকারের গরজ পড়ল কেন রাঙাঠাকরুণের। এখন, যদি মেয়েটাকে খুঁজে না-পাওয়া যায়! যদি তার ভালো-মন্দ কিছু ঘটে যায়।···তাহলে তরুবালার মা-বাপের কাছে কী জবাবদিহি করবেন রাঙাঠাকরুণ। আর, ও মেয়ের ভাবগতিক সুবিধের নয়—এই ট্রেন থেকে লাফিয়ে পড়তে যায়, এই রেলের যাত্রীর সঙ্গে গায়ে পড়ে আলাপ করতে যায়—নাঃ, রাঙাঠাকরুণ পাগল হয়ে যাবেন ভেবে-ভেবে।

হাটতলাতে কোনো মানুষকেই রাঙাঠাকরুণ বিশ্বাস ক'রে জিগ্যেস করতে পারলেন না তরুবালার কথা। পুরুষজাতকে ত চিনতে তাঁর বাকী নেই, মুখ থেকে 'হাঁ' ক'রে কথাটি খসাতে যা দেরি—অমনি পুরুষজাত উপকারের নামে কি মতলব ফেঁদে বসে কে জানে।

তিনি অবশেষে অনুমান করলেন, তরুবালা নিশ্চয় স্টেশনে ফিরে গিয়ে থাকবে। আহা আদুরে মেয়েটা, না হয় বয়সই হয়েছে, তা বলে মনটা এখনো শাদা! আঁধার, অচেনা গঞ্জ গাঁ জায়গায় একা থাকতে ভয় পেয়ে নিশ্চয় তরু কলকাতায় ফেরার ট্রেন ধরতে স্টেশনেই ফিরে গেছে।

হতাশার ধাক্কা কাটিয়ে রাঙাদি আবার গোপালের নাম জপ্‌তে জপ্‌তে স্টেশনে গেলেন।

কিন্তু সেখানেও তিনি তরুবালার কোনো চিহ্ন আবিষ্কার করতে পারলেন না। যেখানেই মানুষ নজরে পড়ে সেখানেই রাঙাদি ছুটে যান। এক জায়গায় দূর থেকে মনে হ'ল যেন একটি নারী মূর্তি! এগিয়ে কাছে গিয়ে রাঙাদি দেখলেন, তারপর আপন মনেই বল্‌লেন—নাঃ।

রমণীমূর্তি মুখ ফেরাতেই দেখা গেল এক বৃদ্ধা।

রাঙাদি চলে যাচ্ছিলেন, বৃদ্ধার ডাকে আবার ফিরতে হয় তাঁকে। বৃদ্ধা বল্‌লেন - অ দিদি, আপনিও বুঝি গাড়ি পাননি? তা এখানেই বসুন না, দুটো সুখদুঃখের কথা ক'য়ে বাঁচি। আমরাও গাড়ি পেলাম না ভাই-।

তারপর বৃদ্ধা এদিক-ওদিক তাকিয়ে চোখ মট্‌কে বল্‌লেন—তা আপনার সঙ্গের সেই মেয়েটিকে দেখছিনে যে?

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে রাঙাদি বল্‌লেন—তাকেই ত খুঁজছি দিদি!

বৃদ্ধা হেসে বল্‌লেন—মিথ্যে হাঁপিয়ে মরছেন কেন, সময় হ'লে ঠিক ফিরবে। বসুন এক জায়গায় থির হয়ে। ও কি আর আগলে আগলে রাখা যায় ভাই, বয়েসের গুণ—বলি বয়েস ত আমার-তোমারো ছিল দিদি!

রাঙাদি কোনো জবাব দিলেন না। মনে মনে গোপালকে স্মরণ ক'রে আবার তরুবালার খোঁজে উল্টো দিকের প্লাট্‌ফর্মে চলে গেলেন।

বৃদ্ধা আপন মনে বললেন—ডাগোর-ডোগোর মেয়ে কি তীর্থে আনে। যেমন বুদ্ধি—। আরে বাবা এখানে যতো পাজির পাঝাড়ার আড্ডা এ-ত জানা কথা।

খানিকক্ষণ পরে রাঙাদি আবার ফিরে এলেন। উদ্বেগে, ক্লান্তিতে তাঁর পা দুটো যেন আর সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারছে না। দু-চোখ অশ্রুসিক্ত। হাতের উপর গোপাল বিগ্রহ যেন পুতুলের মতো নিষ্প্রাণ।

তাঁকে দেখে বৃদ্ধার মুখ চুল্‌কে ওঠে, অনেকক্ষণ মুখ বুজে থেকে বৃদ্ধা হাঁপিয়ে উঠেছিলেন। রাঙাদিকে দেখে সমাদর ক'রে ডাকলেন—এসো দিদি, ব'স! তা তোমার সে নাত্‌নীকে পেলে ভাই!

—না, মা!

—সেয়ানা মেয়ে, যাবে কোথায়! সঙ্গে লোক-টোক আছে?

—না।

—তাহলে, টাকাকড়ি?

—তা আছে মা!

—তবে আর কি! বাবা কালভৈরবের ইচ্ছে। একটু দেখে শুনে আনন্দ ক'রে বাড়ি ফিরবে ঠিক।

রাঙাদির কথা কইতে ইচ্ছে করছে না, তবু একজন এ রকমভাবে সহানুভূতি দেখালে কথা কইতেও হয়। তাই বল্‌লেন—কি জানি মা!

—ওর আর জানাজানি কি, সোমত্ত বয়েস! হাতে কাঁচা পয়সাও রয়েছে। তা পাঁচজন মরদের চোখে-চোখে থাকবে। ভয় কি? আমরাও কি আর বয়েসকালে এরকম হারিয়ে যেতে ছেড়েছি!

আড়চোখে রাঙাদির দিকে তাকিয়ে বৃদ্ধা একটু জোরে হেসে বল্‌লেন—আহা, হারানোর আর দোষ কি—পথ চিন্‌তুম না যে! তা হ্যাঁ দিদি, তুমি বুঝি কখনো হারাও নি?

রাঙাদি গোপাল বিগ্রহকে আঁকড়ে ধরে বল্‌লেন—ওসব কথা থাক দিদি। এখন কালভৈরবের দয়ায় ছুঁড়িকে একবার নাগালের মধ্যে পেলে হয়। চেনে না ত রাঙাঠাকৃরুণকে, ঝেঁটিয়ে বিষ ঝাড়া কাকে বলে একবার দেখিয়ে দিই।

বৃদ্ধার দু-চোখে কৌতুকের জোয়ার এসেছে—আহা, ষাট বালাই, আমি বলি কি দিদি, যে বয়েসের যা! আবার তোমার আমার মতো বয়স পেলে তখন দেখো ঠিক ঠাকুরদেবতার পায়ে মাথা কুটবে। এই ত বয়েস দিদি, উঠতি দাঁতে সামনে যা পাবে কামড়ে দেখবে বইকি, তা দেখবে।

রাঙাদি অপ্রসন্ন কণ্ঠে বলেন—গোপাল গোপাল! বিপদতারণ মধুসূদন, তুমি থানে থেকে কানে শুনছো বাবা, সব দেখছো—

রাঙাঠাকুরুণের কোনো দোষ নেই। গোপাল! উদ্ধার করো বাবা, তোমায় সোনার গোট্ গড়িয়ে দেব!

বৃদ্ধা বেশ মিষ্টিমুখে শুরু করলেন—আহা ষাট্ বালাই, গোপালের বাড়-বাড়ন্ত হোক্! দিদি, তোমার যেন ক্ষিদেতেষ্টা নেই—বলি, কিছু খাওয়া দাওয়া হয়েছে, নাকি, নাত্নীর জন্যে সেটুকুও জলাঞ্জলি দিয়ে বসেছো?

—আর খাওয়া, মুয়ে আগুন এ পোড়ার পেটে।

—তা বল্লে কি হয়, খেতে হবে বই কি! এসো, আমার পুঁট্লীতে চালভাজা গুঁড়ানো রয়েছে—তাই দুটি-দুটি খাই।

—তুমি খাও দিদি, আমি একটু খোঁজ করি।

—থামো দেখি, ও মেয়েকে কি খুঁজে পাবে? আপনিই ধরা দেবে। তুমি আপনার কালভৈরব দর্শন করো, ক'রে নিশ্চিন্দি মনে ঘরে ফেরো। খাও দিদি দুটো গুঁড়ো মুখে দিয়ে ঢক্ঢক্ ক'রে এক ফেরুয়া জল খেয়ে কোমরটা টান করো রেতের মতো।

রাঙাদি একবার ভাবলেন, পুলিশে একটা খবর দেবেন। কিন্তু আবার ভাবনা হ'ল যদি তরুবালা কুলকাঠিতে তার মামার বাড়ি একাই চলে গিয়ে থাকে! তাহলে মাঝখান থেকে মুখে-মুখে কেলেঙ্কারী রটতে পারে—তখন আরও ত ফ্যাসাদ হবে!

অনেক রাত অবধি তিনি জেগে রইলেন। তাঁর নতুন সখী পরম নিশ্চিন্ত মনে নাক ডাকিয়ে ঘুমোতে লাগলেন। এর মধ্যে দুটো মেল ট্রেন সদর্পে গর্জন ক'রে বেরিয়ে গেল!

॥ পাঁচ ॥

তরুবালাকে মদনের খপ্পরে জমা দিয়ে যুবকটি যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচে। সেই সন্ধ্যে হয়ে অবধি মেয়েটা আঠার মতো তার সঙ্গ নিয়েছিল। চায়ের দোকানে ফিরেই সে হাঁক দিল—কই হে, আমার ডিনার কোথায়!

অল্পবয়সী ছেলেটা দাঁত মেলে হেসে একটা সেলাম ঠুকে দিয়ে বল্‌লে—জী সাব, খানা তৈয়ার।

---বহুৎ আচ্ছা। আমার একদম টাইম নেই।—

ব'লেই চাপা গলায় কি সব কথা বল্‌লে ছোক্‌রাকে। ছেলেটি মাথা নেড়ে বললে—আচ্ছা, ওস্তাদ, ওই ডগডগে মেয়েটাকে কোথায় পেলেন?

—আবার! ওসব কথায় তোর কি কাজ! তুই বাপু চা দে দিকিন্ চট্‌পট্।

—রাগ করলেন? কিন্তু, এক নজরেই চেনা যায়!

— ভ্যাখ বেশী ঘাঁটাস নে—

চা খেয়ে একটা বাণ্ডিল বেশ কায়দা ক'রে জামার আস্তিনের মধ্যে লুকিয়ে নিয়ে যুবক বল্‌লে—আচ্ছা ভাই, আজ তাহলে—

তার কথা শেষ হবার আগেই আচমকা হুড়মুড় শব্দ শুনে যুবক থমকে থেমে গেল।

ছেলেটাও ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে বল্‌লে—ব্যাপার কী?

এমন সময়ে ঝড়ের বেগে তরুবালা ঢুকল দোকানের মধ্যে। ভয়ে ওর ছুটো চোখ যেন অস্বাভাবিক বড় দেখাচ্ছে। হাঁপাতে হাঁপাতে যুবকের মুখের সামনে তর্জনী উঁচিয়ে ও বলে—তোমরা—তোমরা ছোটলোক, ইতর!

তরুবালার দিকে তাকিয়ে যুবক বিমর্ষভাবে বলে—হুঁ!

ততক্ষণে মদনও পৌঁছো গেছে। মদনের নাক বেয়ে দরদর বেগে রক্তধারা নেমেছে। উত্তেজনায় তার তামাটে মুখখানা গন্‌-গন্‌ ক'রে জ্বল্‌ছে যেন। যুবককে দেখেই মদন তার হাত চেপে ধরল।

যুবক বললে—এ্যাই, জামাতে রক্ত লাগাবি নে। মেয়েমানুষের মার খেয়ে যে রক্ত বেরিয়ে গেল। হয়েছে কি?

মদন দাঁত খিঁচিয়ে বললে—এ তোর কারসাজি। জগা, তুই শেষে আমাকে ঠকালি? জোচ্চোর, তুই পয়লা নম্বরের জোচ্চোর।

যুবক একবার মদনের দিকে তাকিয়ে অপ্রতিভভাবে বলে—মার খেলি, ছু-ঘা দিতে পারলি না।

হাঁপাতে হাঁপাতে মদন বল্‌লে, কেউটে সাপ ধরে এনে আমার ঘরে ছেড়ে দিইছিস্‌।

যুবক বলে—হুঁ, বুঝেছি। হয়েছে কি? টাকাকড়ি দিস্‌নি বুঝি?—তাই বল্‌।

তরুবালা ধমকে ওঠে—কি হচ্ছে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে! চলো, এখান

থেকে চলো—আমি তখনি বলেছিলাম যে, আমাকে গরুর গাড়ির আড্ডা দেখিয়ে দাও!

যুবক বিরক্তিভরে বল্‌লে—আবার কেন জ্বালাচ্ছ!

মদন তখনও যুবকের হাত ছাড়েনি। তরুবালাকে যুবকের সঙ্গে এত সহজভাবে কথা বল্‌তে দেখে মদন সন্দিগ্ধভাবে দু-জনকে দেখে নিল। তারপর যুবকের বুকে ডান হাতের ক'ড়ে আঙ্গুলের টোকা দিয়ে বললে—দে, আমার টাকা ফেরত দিয়ে দে জগা! ওই পাজি নচ্ছার মাগীর জন্যে আমি দালালী দেবো না।

যুবক হাসতে হাসতে টাকা বার ক'রে গুণে গুণে দিল।

যুবকের মুখের হাসি এখনো বজায় রয়েছে। সে বললে—মদন, তুই কোনো কম্মের না। আরে মাষ্টার, আগুন নিয়ে কেউ তারাবাজি খ্যালে, কেউ বা গাঁজার কল্কে ধরায়। কিন্তু তুই বেকুবের মতো হাত পোড়ালি! সে দোষ আবার উল্টে আমার ঘাড়ে চাপাচ্ছিস্।

তরুবালা এবার যুবকের এ্যাটাচী কেসটায় ধাক্কা দিল—আঃ, চলো এখান থেকে! এ নরককুণ্ড!

মদন ক্রুদ্ধকণ্ঠে শুধু বলে—জোটের পায়রা। জগা, তোর ফন্দি বুঝে নিলুম। আমাদের কেবল নাকই ফাটে রে, তোর মতো কটা চামড়া থাকলে দেখে নিতাম একবার মেয়েমানুষের জাতকে।

যুবক ঠোঁট উল্টে বলে—কপাল না কপাল। রোজগারের নাম নেই, মেহনতটাই মাটি।

তরুবালা অস্ফুটস্বরে কি যেন বলে।

যুবক হতাশভাবে ঘাড় নেড়ে বেরিয়ে পড়ল।

আবার অন্ধকার।

বাইরের ফাঁকা হাওয়ায়, রাত্রির শান্ত স্নিগ্ধ মায়ায় তরুবালা যেন নিজেকে ফিরে পেল। অন্ধকার যে এত ভালো লাগতে পারে তা তরুবালা জীবনে এই প্রথম অনুভব করে।

যুবকের দিকে নজর পড়তেই হঠাৎ তরুবালা একটু আগের সব ঘটনার ছবি দেখতে লাগলো। একী! দুঃসহ যন্ত্রণায় ওর মগজ ছিঁড়ে পড়ছে যেন! যুবকের উদ্দেশ্যে ও শুধু বল্‌লে—তোমার কাছে বুঝি মেয়েমানুষের দাম নেই?

চল্‌তে চল্‌তে হঠাৎ থম্‌কে দাঁড়িয়ে যুবক উচ্চকণ্ঠে হেসে ওঠে—আছে বই কি। দশ, বিশ,পঞ্চাশ—যার জন্যে যতো টাকা পাই।

এ কথায় তরুবালার যতখনি ভয় পাওয়া উচিত ছিল ততটা, পেল না ও! মদনের মতো পশুরা যে, আসলে কাপুরুষ সেটা তরুবালা প্রমাণ করেছে। আর এই অস্বাভাবিক অপরিচিত নীচের তলার মানুষগুলোর সম্পর্কে তরুবালার অবজ্ঞার শেষ নেই, ঘৃণাও কম নয় ওর! তবে ভয়ের করল থেকে তরুবালা নিজেকে মুক্ত ক'রেছে। তাই যুবকের কথা শুনে হাসলো তাচ্ছিল্যের হাসি—ও, তোমার বুঝি মেয়েমানুষের ব্যবসা?

মুক্ত কণ্ঠে হাসতে হাসতে যুবক জবাব দিল—আরে, এটাই ত আসল ব্যবসা! পৃথিবীর সবচেয়ে পুরনো আর সেরা কারবার!

তরুবালা ধম্‌কে উঠল—কি যা তা বল্‌ছো?

—নয় ত কি! মদ আর মেয়ে এই কারবার হাজার হাজার বছর ধরে সমান তালে চলেছে। এ কারবারে লোকসান কারুর কখনো হয় নি। কিন্তু আমার কপালই মন্দ! নইলে, তোমার মতো ঝুটো ভেজাল জোটে! আরে বাবা, এতে কারুর কোনো

ক্ষতি নেই বরং সবারই লাভ। মাঝখান থেকে আমার যদি দুটো পয়সা হয়, তাতে কার কি এসে যাচ্ছে বুঝি নে!

তরুবালা নাক সিঁটকে বল্‌লে—ইস্, তোমার মন এত নোংরা!

যুবক ব্যস্তভাবে বল্‌লে—থাক, আর ধম্মকথা শোনাতে এসো না। অনেক লোকসান ঘটিয়ে দিয়েছ। এখন ভাই তোমার পথ তুমি ছাখো, আমাকে আর জ্বালিয়ো না। ওই যে, ওইদিকে ইস্টিশানের রাস্তা, সোজা চলে যাও।

তরুবালা থম্‌কে দাঁড়ালো। এত দুর্ভোগের পরও তরুবালা যেন যুবককে অবিশ্বাস করতে পারে না, বরং ওর মনে হচ্ছে যে, মানুষটা আসলে খারাপ নয়—ওর মধ্যে এক অনাসক্ত বৈরাগীর বাস। এখন এই অন্ধকার রাতে একা-একা স্টেশনে গিয়েই বা কি করবে তরুবালা। সেখানেই যে বিপদ নেই তাই বা কে জানে। তার চেয়ে এ মানুষটিরও ওপর নির্ভর করা সোজা।

উৎসুকভাবে ও বল্‌লে—তুমি এমনিভাবে আমাকে পথে ছেড়ে দেবে তারপর?

—আমি ত তোমাকে সঙ্গে থাকতে ডাকি নি!

—তা বলে একলা মেয়েমানুষ আমি, অন্ধকারে কেউ কোত্থাও নেই—

যুবক উত্যক্ত হয়ে জবাব দেয়—আমি ত ব্যবস্থা ক'রেছিলাম, তা তোমার পছন্দ হ'ল না। আমার দোষ কি?

—তোমার ও ব্যবস্থা কে চেয়েছিল?

—তবে কি?

—আমি গরুর গাড়ির কথা বল্‌ছি!

—এ ভারি মুস্কিল! অত বাজে সময় আমার নেই। এসো!

—কোথায়?

—অত কথায় কাজ কী? তুমি অচল টাকা। থাকো, রাতের মতো একটা ব্যবস্থা ক'রে দিচ্ছি। তোমার ওই মেকী সতীত্ব নিয়ে রাতটুকু এই চালাতে কাটিয়ে দাও। সকালে উঠে দিনের আলোয় যেখানে ইচ্ছে চলে যেয়ো।

কথা বল্‌তে বল্‌তেই এরা পথ চল্‌ছিল। সাম্‌নে একটা চালা ঘর দেখে ছোক্‌রা দাঁড়ালো।

তরুবালা হঠাৎ প্রশ্ন করে—রাত কত হ'ল।

—সিঁদেল ছিঁচ্‌কে চোরেদের বেরুবার সময় এখনো হয় নি। কলকাতা শহরে ফুর্‌ফুরে ফোতো বাবুরা এখনো ঘরে ফেরেনি।

—হয়েছে, আর হিসেব দিতে হবে না।

—তাহলে এখানে তুমি থেকে যাও। আমি পথ দেখি।

তরুবালা সাম্‌নের চালার দিকে এক নজর তাকিয়ে আবার যুবকের দিকে চাইল। ও দেখল, যুবক হাঁটতে হাঁটতে কিছুদূর এগিয়ে গেছে।

তরুবালার বুকের মধ্যে কেমন একটা ভয়ের গুমোট্‌ জমে ওঠে। এই তেপান্তরে, একা-একা এই চালার নীচে সারারাত কি ক'রে থাকবে ও? হঠাৎ মরিয়া হয়ে ও ডাকলো—শোনো! একটা কথা বল্‌ছিলুম।

যুবক বিরক্ত হয়ে ফিরে দাঁড়ালো, কিন্তু এক পাও এগিয়ে এল না। সে অত্যন্ত বিরক্ত হয়েছে—আবার কী?

তরুবালা ত্বরিতে যুবকের কাছে এসে কাঁপা গলায় বলে—

এখানে বড্ড চাঁদের আলো। ভয় করছে একলা। যদি কেউ দেখতে পায়!

—ভালোই ত, তার সঙ্গে তার ঘরে গিয়ে উঠবে!

তরুবালা বল্‌লে—না, না, আর কোথাও আমি উঠতে চাই নে! শোনো। তুমি কোথায় যাবে?

শ্লেষের হাসি হেসে যুবক বলে—আমি? কেন, সে কথায় তোমার কাজ কি! মেয়েমানুষের কাছে কৈফিয়ৎ দেবার বয়েস আমার নেই। আমি যাচ্ছি মাটির তলায়। তোমার জন্যে আমার ব্যবসা-বাণিজ্য ভাসিয়ে দিতে পারি না।

জবাবটা দিয়েই যুবক হন্‌-হন্‌ ক'রে নিজের পথে চল্‌তে শুরু করল। পেছন ফিরে দেখা তার স্বভাবে লেখে না। তরুবালা যেখানে দাঁড়িয়েছিল সেখানেই চিত্রাপিতের মতো দাঁড়িয়ে থাকে। ও যেন পৃথিবীর মানবসমাজের কাছে অবহেলিত হয়েছে—এমনই অসহায় বেদনার ছাপ ফুটে উঠেছে ওর মুখে। এই মুহূর্তে তরুবালার নিজের বাড়ির কথা মনে পড়ে। আর সেই সঙ্গে হঠকারিতার জন্য নিজের উপরও রাগ হয়। তরুবালা নিজের চোখেও অপরাধী। কেন সে বাড়ির সকলের উপর অভিমান করল, কেন রাগ ক'রে মামাবাড়ি রওনা হ'ল একবস্ত্রে, একলা! প্রতিবাদ! পিতামাতার খেয়াল-খুশির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা! তার জন্য এইভাবে পথে বেরিয়ে পড়া!··· তাই যদি হয়, তবে এখন এই জনহীন প্রান্তরে থাকাতেই বা এত আপত্তি উঠ্‌ছে কেন?

ওর চোখের সামনে চলমান মনুষ্যমূর্তিটা আস্তে আস্তে ছোট হয়ে আসে। লোকটা চলে যাচ্ছে। ওর নিজের কাজ রয়েছে।

ওর জীবনের লক্ষ্য ত তরুবালার মতো অনিশ্চিত নয়। যে পথে ও চলেছে তরুবালার চোখে সে পথ নোংরা হ'তে পারে কিন্তু ওই যুবকের কাছে সেটাই এক সুনিশ্চিত পথ।

হঠাৎ কোথা থেকে শেয়াল ডেকে উঠল। তরুবালার মনে হয়, খুব কাছে—হয়তো ওই চালাটার পিছন থেকেই শেয়ালগুলো ডেকে উঠেছে। না, ওর সামনে এপাশে ওপাশে চারদিক ঘিরে হাজার হাজার শেয়াল চিৎকার করছে!

তরুবালা দুই কানে আঙুল দিয়ে দাঁতে দাঁত চেপে ঠোঁট কামড়ে শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। না, তবু ওদের ডাকাডাকির শব্দ থেকে নিষ্কৃতি নেই!

ভয় পেয়েছে তরুবালা। এখানে কি ক'রে থাকবে? জীবনের, মানুষের, সমাজের উদ্যত নির্বাসনদণ্ড কি এই শিবারবরূপে তরুবালার ভাগ্যের দিকে রাত্রির পথ ধরে এগিয়ে আসছে? ওর চোখের সামনে থেকে ওই শেষ মানুষটি পর্যন্ত সরে যাচ্ছে!

তরুবালা প্রাণপণে দৌড়তে লাগলো। ওর চোখের সামনে যুবকের ছায়া হয়ে যাওয়া চলার ছন্দটা ক্রমশঃ স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

পায়ের শব্দ পেয়ে যুবক একটু আড়ালে—পাশের গাছের গায়ে দেহ মিশিয়ে দিয়ে দাঁড়ায়। ও অনুমান ক'রেছিল তরুবালা ওর পিছনে আসছে! তাই গা-ঢাকা দেবার চেষ্টা করে, কিন্তু ধরা পড়ে গেল।

তরুবালা তার মুখোমুখি দাঁড়ায়। ওর ঘন শ্বাস-প্রশ্বাসের চেহারা দেখে যুবক এবার অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে উঠল।—আমি জানি, কেন

যেতে দিচ্ছো না। পুলিশ! তুমি পুলিশের চর। কেন, মিছেমিছি ন্যাকামি করছিলে?

—কি যা তা বল্‌ছ তুমি?

—আমি ঠিকই বল্‌ছি। তোমাকে লেলিয়ে দিয়েছে থানার শয়তানেরা। বেশ বুঝতে পারছি। কিন্তু দশটা টাকাও এখনো কামাই নি, কোত্থেকে তোমাকে এর বেশি দেবো?

তরুবালা বাধা দিল—কিন্তু টাকা ত আমি চাইনি।

যুবকের চোখে-মুখে অবিশ্বাসের তীক্ষ্ণ হাসি ফুটে ওঠে। তার কণ্ঠে তীব্র উত্তেজনা ফেটে পড়ে—বটে! টাকা ছাড়া মেয়েছেলে কখনো আর কিছু চান?

তরুবালা মানুষের সঙ্গ পেয়ে আবার নিজেকে সহজভাবের মধ্যে দেখতে পায়। যুবকের এই উত্তেজনার আতিশয্য দেখে ও মনে মনে স্বস্তিবোধ করে। মুখে বললে—ওরকম করলে সত্যি তোমায় পুলিশে ধরিয়ে দেবো কিন্তু—

—তা ত দেবেই! মদনকে ছোবল মেরে মন ওঠে নি, এবার তাই আমার ওপর ফণা তুলেছ। বাঃ!

তরুবালার হাসি থামে না। ও যেন খুব মজার একটা খেলা পেয়ে খুশিতে মেতে উঠেছে—আমি কি ভাবছি জানো?

তরুবালার মুখের পানে চোখ তুলে তাকিয়ে যুবক কি যেন পড়তে চেষ্টা করে। কিন্তু ব্যর্থ হয়ে বললে—আমাকে রেহাই দাও। তোমার ভাবনার কথা তোমারই থাক। দোহাই তোমার, আমাকে যেতে দাও। ঘরে ফিরে যাও—

—যদি ঘরে না ফিরি?

যুবক মাথা নেড়ে বলে—সে ত সবাই জানে। ঘর ভাসিয়ে পথে যে মেয়ে বেরোয় সে কেন ঘরে ফিরবে? তার কাজই হচ্ছে ঘর ভাসানো। কিন্তু একটা বেজায় ভুল করেছ।

তরুবালার চোখ দুটো কৌতুকের সন্ধানে নেচে ওঠে—কি?

যুবক বললে—আমাকে মক্কেল ঠাউরেছ! আরে বাবা, আমি যে-কোনো সুবিধে পেলেই তোমাকে বেচে দেবো, তুমি টেরও পাবে না।

তরুবালা চম্‌কে উঠল এ কথায়।

তবু বললে—পাপের ভয় করো না?

—তা করি বৈকি!

—তাহলে?

—তার জন্যে ত সুন্দর ব্যবস্থা রয়েছে! বুড়ো বয়সে পিঁপড়েকে চিনি খাওয়াবো, আর যদি তেমন পয়সা হয় গোটা দুয়েক ধর্ম্মশালা বানিয়ে দেবো। ব্যস্ সব পাপ খণ্ডে যাবে।

—বা রে, তা কি ক'রে হয়?

যুবক হেসে জবাব দিল—এতকাল ধরে এ-ই হয়ে আসছে। নইলে এত ধর্ম্মশালা গজালো কোত্থেকে! যাক্ মিছে ভয় দেখিয়ে সুবিধে করতে পারবে না।

ওরা দু'জনেই আবার চল্‌তে শুরু করল। তরুবালা কোনো কথা বলে না। যুবকও সাড়াশব্দ করে না। হয়তো সে মনে মনে ভাবছে, কি ক'রে এই নাছোড়বান্দা মেয়েটার হাত থেকে মুক্তি পাওয়া যায়।

অনেকখানি পথ চলেছে ওরা।

তরুবালার মন্দ লাগে না শান্ত নির্জন রাস্তায় চল্‌তে—অন্তত ওই

শিবারব মুখরিত জনশূন্য চালাঘরের চেয়ে এ অনেক ভালো। ভয় নেই। নির্বাসনের ভয়ঙ্কর যন্ত্রণা নেই।

ওর ভাবনার সুতো ছিঁড়ে গেল যুবকের কথায়—ওই যে, ওখানে একটা যাত্রিশালা রয়েছে। তুমি নির্ভাবনায় আজকের রাতটা ওখানে থাকতে পারো—না, চাঁদের আলো নেই—বেশ ঘুপ্‌সি আঁধার কুঠরী! আর মদনও নেই, বুঝলে। চলে যাও—

তরুবালা পা বাড়াতেই যুবক বললে—আচ্ছা দাঁড়াও একটু দেখি?

তরুবালা বাধা পেয়ে দাঁড়ালো। যুবক এ্যাটাচি কেস হাতড়ে একটা টর্চ বার ক'রে জ্বাল্‌লো। টর্চের আলোয় তরুবালাকে বেশ ক'রে দেখে নিল।

তরুবালা বলে—কি, অমন ক'রে কি দেখচ?

যুবক বল্‌লে—নাঃ, গয়নাগাটি বিশেষ নেই দেখচি। বাড়িওয়ালী কি জায়গা দেবে? তবে চেহারাটা নেহাৎ অচল নয়। দ্যাখো গে বলে-ক'য়ে, যদি তার মেজাজ ভেজাতে পারো।

তরুবালা অপ্রসন্ন মুখে বললে—আচ্ছা, দেখি।

তরুবালা বাড়ির দিকে অগ্রসর হ'তেই যুবক এবার নিশ্চিন্ত হয়ে চল্‌তে শুরু করে।

পিছন ফিরে তরুবালা তাকে এক নজর দেখে নিয়ে সম্মুখের দরজার কড়া নাড়তে লাগলো। তরুবালাকে কড়া নাড়তে দেখল যুবক।

এদিকে দরজা খুলে তরুবালাকে দেখে প্রৌঢ়া আঁটসাঁট চেহারায় বাড়িওয়ালী ভ্রূকুঞ্চিত করে—দুপুর রেতে কি মনে ক'রে গো বাছা?

—এখানে রাত্রে থাকবো!

—এ্যাঁ! থাকবে? তা সঙ্গে মরদ আছে? না একা!

—না, আমি একা।

—না, বাছা। একে মেয়েমানুষ তায় আইবুড়ো—তোমার সঙ্গে পুরুষ থাকলেও বা কথা ছিল। দিন কাল যা খারাপ,—তোমায় ঠাঁই দিয়ে শেষে পুলিশের ফাঁদে পড়তে পারবো নি বাপু। পথ দ্যাখো বাছা!

তরুবালা বেশ মিষ্টি মোলায়েম কণ্ঠে অনুনয় করে—আজকের রাতটুকু শুধু থাকবো। আপনি মেয়েছেলে হয়ে মেয়েছেলের বিপদে এটুকু উপকার করতে পারেন না। টাকা দেবো আমি—

বাড়িওয়ালী সজোরে মাথা দুলিয়ে বললে—ট্যাকার লোভ তুমি বাপু আমাকে দেখিয়ো নি! ও আমার হাতের ময়লা। ফুলমণি বাড়িউলী আমার নাম। এক ডাকে এ তল্লাটের সব্বাই চেনে! বুঝলে, ট্যাকার মায়া যদি করতুম ত ট্যাকার গদাতে গড়াগড়ি দিতে পারতুম।

তরুবালার হাসি পায় কিন্তু হাস্‌তে ভরসা হয় না। মুখখানা অস্বাভাবিক গম্ভীর ক'রে ও বল্‌লে—তবে না হয় এমনিই থাকতে দিন। আমি এখন যাবো কোথায়!

—তা সে কথাটা আগে ভাবতে পারতে বাছা! তোমার রকম সকম ভালো ঠেকছে না, তুমি যাও বাছা,—পুলিশের হাঙ্গামা হ'লে ফুলমণি বাড়িউলীর নামডাক যাবে। আর নামডাক গেলে কোনো মরদের বাচ্ছা এখানে মেয়েমানুষ নিয়ে সেঁদোবে না। সরো, আমার কাজ আছে।

তরুবালা শেষ অনুরোধ করে—মেয়েমানুষের বিপদে আপনি মেয়েমানুষ হয়ে—

মুখের ওপর দরজা বন্ধ ক'রে দিল বাড়িউলী। দরজার ওপিঠে তার গলার স্বর শোনা যায়—তোমাদের আর চিনতে বাকী নেই। বেনোজল ঢুকে শেষে বেড়াজল টেনে নিয়ে যাক আর কী!

তরুবালা পরিশ্রান্ত। হতাশায় ওর মন যেন এখানে এই দরজার ওপর শুয়ে পড়তে চায়। ও বসে পড়ল মাটিতে। আর নড়তে ইচ্ছে নেই। সেই পথিক যুবকটি চলে গেছে নিজের কাজে। তার সঙ্গে দেখা হবে না! তরুবালা নিজের মনে ভাবে, আশ্চর্য মানুষ! পয়সার পিছনে যতো নোংরা গলির দুর্গন্ধের মধ্যে ছুটে চলেছে। অথচ মুখখানা দেখে মনে হয় ওর মনে এক বৈরাগীর বাস। কি সুন্দর চোখ দুটো। ওই চোখের দৃষ্টিতে ত কামনার কোনো ঘোলাটে অন্ধকার নেই। তবে কেন তরুণ যুবক ওই জঞ্জাল ঘেঁটে বেড়াচ্ছে!

এতক্ষণ পথের ওপাশে আলোর নীচে যুবকটি দাঁড়িয়েছিল। চলে যেতে যেতে আবার কি মনে ক'রে সে ফিরে এসেছিল।

তার মনে বোধ হয় সংশয় ছিল। ফুলমণি বাড়িওয়ালী যদি আশ্রয় না দেয় তাহলে এই অসহায় মেয়েটি কি করবে? একটু আগে টর্চের আলো জ্বেলে তরুবালার অলঙ্কারাদির খোঁজ নিতে গিয়ে যুবক সোনাদানা কিছু দেখতে পায়নি! সিগারেট ধরিয়ে টান্‌তে টান্‌তে সে অন্যমনস্ক হয়ে ভাবে—ভারি সুন্দর মুখখানি। সরল দৃপ্ত চোখের চাহনী! এমন মেয়ে যেন সে এর আগে কখনও ভ্যাখেনি। আসলে কোনো মেয়েকেই সে নজর দিয়ে দ্যাখেনা। আজ যে এই মেয়েটির সঙ্গে এতক্ষণ কেটেছে, তাতে বারেকের জন্য কোনো কৌতূহল জাগেনি তার মনে—কি ওর নাম, কোথায় ওর বাড়ি, বয়সই বা কত?—কিছুই সে জানতে চায় নি, জানেও নি। কিন্তু টর্চের আলোতে যে

অসামান্য মেয়েকে দেখেছে, তাকে এইভাবে ভাগ্যের হাতে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে চলে যেতে তার মন সরছে না। সে তাই ফিরে এসেছে। দেখতে চায় তরুবালা আশ্রয় পায় কি না?

নাঃ। তার অনুমানই ঠিক। মেয়েটাকে বাইরে রেখে ফুলমণি কপাটে খিল এঁটে দিয়েছে। পুরো সিগারেটটা পুড়তে এখনও দেরী রয়েছে। অধীরভাবে জলন্ত সিগারেটটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে যুবক আস্তে আস্তে তরুবালার দিকে একটু একটু ক'রে এগিয়ে চল্‌ল। যেন তরুবালাকে ফুলমণি ঠাঁই না দেওয়াতে সে আদৌ বিরক্ত হয়নি—খুশিও হয়ে থাকতে পারে।

তাকে দেখে তরুবালা খুশি হয়েছে খুবই। তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়িয়ে বল্‌লে, তাহলে তুমি যাওনি?

সে কথার জবাব এড়িয়ে যুবক বললে—জায়গা দিল না?

তরুবালা জবাব দিল—তুমি সঙ্গে থাকলে দিত।

বল্‌তে বল্‌তে অভিমানে ওর কণ্ঠস্বর ভারী হয়ে আসে—তোমার জন্যে আমাকে এই অপমান সইতে হ'ল।

জবাব দিল না যুবক।

তরুবালা বললে—রাত এখন কতো?

—এখনো অনেক বাকী।

—তোমার কাজ?

—তোমার জ্বালায় কিছুই হচ্ছে না।

—আমি কি করি বলো তো! আচ্ছা, মুস্কিলে পড়েছি নিজেকে নিয়ে।

—তোমার আর কি! দিব্যি আমাকে হয়রান করছ ব্যস্।

তরুবালা অনেকক্ষণ অবধি একটু যেন আত্মবিস্মৃতভাবে এই অপরিচিত যুবকের দিকে চেয়ে রইলো। লোকটা অবাক করেছে তাকে। শুধু যে আগ্রহ নেই তা নয়, স্নেহ-মোহের চিহ্নমাত্র নেই। ওর চাহনী দেখলে মেয়েমানুষের সমস্ত অহঙ্কার যেন ঘুচে গিয়ে সর্বাঙ্গ কুণ্ঠিত হয়ে আসে। আর কিছু নয়, তরুবালা শুধু অনুভব করে সে নিরাপদ।

ধীরে ধীরে সে প্রশ্ন করে, তোমার নাম কি?

পুরুষটি জবাব দেয়, জগদীশ।

॥ ছয় ॥

জগদীশ আর তরুবালা দু'জনেই পথের সন্ধানে চল্‌তে থাকে অন্ধকার রাতে। তরুবালা খোঁজে নিজেকে। আর জগদীশ যেন তরুবালার স্বরূপকে। এ মেয়েটি কি চায়? কেন এইভাবে জগদীশের পিছনে চলেছে? টাকা যে চায় না, সে যে অন্যকিছু চাইতে পারে সেটা জগদীশের জ্ঞানের অভিধানে অজ্ঞাত। তবে কি মেয়েটির কোন মতলব নেই। পথ হারিয়ে ফেলেছে!

একসময়ে সে বললে—শোনো!

—কি?

— তোমার মতলব কি?

—মতলব আবার কি হ'তে যাবে?

—তাহলে একটা কথা শুনবে?

জবাব না দিয়ে তরুবালা তাকালো জগদীশের মুখের দিকে।

জগদীশ গম্ভীরভাবে বললে—যদি রাজী থাকো তো, একটা ভালো লোকের কাছে তোমাকে ভিড়িয়ে দিতে পারি।

তরুবালার চোখদুটো অন্ধকারে জ্বলে উঠ্‌ল—মেয়েছেলেকে একা পেয়ে এভাবে অপমান করতে তোমার বিবেকে বাধছে না?

জগদীশ স্বচ্ছন্দে হেসে উঠে যেন তরুবালার কথাগুলো ঝেড়ে ফেলে দিল,—চটো ক্যানো! এর মধ্যে অপমান, বিবেক, ওইসব বাছাই করা কথা জোটাও ক্যানো! বিশ্বাস করো সে লোক্‌টা খুব ভালো। আরে, মোটা টাকা পাবে! পায়ের ওপর পা দিয়ে মহারানী ভিক্টোরিয়ার মতো তোফা আরামে থাকবে। ওই ফুলমণিকেও টেক্কা মারতে পারবে।

তরুবালার বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হয় না যুবক মুখে যা বল্‌ছে তার মধ্যে সত্যই কোনো প্রস্তাব আছে ব'লে। হয়তো ঠাট্টা করছে। কিন্তু রসিকতা ক'রেও যদি এসব কথা কেউ বলে তাহ্‌লে তরুবালার গা ঘিন্‌-ঘিন্‌ করে।

ও বললে—মেয়েছেলের ওপর তোমার এতটুকু শ্রদ্ধা নেই?

—আবার বুক্‌নি! থামো, মেয়ে কি আবার মানুষ, যে শ্রদ্ধা করতে হবে।

—তবে বুঝি তারা বনমানুষ! তোমার দেখছি এককড়াও শিক্ষা-দীক্ষা হয়নি।

—খুব শিক্ষা হয়েছে! নইলে দেখতে তোমায় শ্রদ্ধা করতুম। আরে বাবা, তোমরা যতই শেখো না কেন, এই শর্মার কাছে ছেলে-মানুষই থেকে যাবে!

—তাই বটে! তোমার পাল্লায় পড়ে সেটা টের পাচ্ছি। নইলে এতক্ষণ ধরে চরকিপাক খাওয়ালে তবু গরুর গাড়ির আড্ডাটা দেখিয়ে দিলে না। জীবনে আর কখনো যদি পুরুষ মানুষকে বিশ্বাস করি!

বল্‌তে বল্‌তে তরুবালা নিজের মনের মধ্যে ডুব দেয়।

বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়েছিল উদ্দেশ্যহীন ভাবে, ঝোঁকের মাথায়।

তখন ওর জীবনের প্রতি বিন্দুমাত্র বিশ্বাস ছিল না, শ্রদ্ধা হারিয়েছিল মানুষের ওপর। সেই মানসিক পরিবর্তনটাই যেন ওর বাকী জীবনের সঙ্গী হয়ে থাকবে—এইরকমই ধারণা হয়েছিল তরুবালার। সন্ধ্যের পরও পথে পথে ঘোরার সময়ও ওর সেই অনীহা প্রবল ছিল। কিন্তু এখন একটু একটু ক'রে আবার যেন পৃথিবীকে ভালো লাগছে। মনে হচ্ছে আত্মহত্যার চেয়ে বেঁচে থাকার মূল্য বেশী, মনে হচ্ছে সমাজ সংসারকে পুরোদস্তুর বরবাদ করার মধ্যে বিরাট গৌরব নেই। তার চেয়ে ফিরে গিয়ে নতুন সুরে মনের তার বেঁধে নেওয়াই বোধ করি শ্রেয়।

জগদীশ ওর পাশে চল্‌ছে। ওর মুখের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ প্রশ্ন করে—তোমার নামটা যেন কি?

আচম্‌কা মানুষের গলার স্বর শুন্‌ল যেন তরুবালা। সম্বিত ফিরে পেয়ে সাড়া দিল—তরুবালা।

জগদীশ উচ্চকণ্ঠে হেসে উড়িয়ে দিল—উঁহু! আসল নামটা বলো, ভাঁড়ানো নামটা অন্যের জন্যে থাক।

তরুবালা ভ্রূকুঞ্চিত করল—তার মানে? তোমার এত অবিশ্বাসে ভক্তি কেন বল্‌তে পারো! শোনো, তোমার বিশ্বাস যাই হোক, জেনে রাখো—জীবনে আমি কখনো মিথ্যে কথা বলি নি।

জগদীশ এবার উচ্চাঙ্গের হাসি হাসে—সব মেয়েই এ কথা বলে। পথে নামলেই দাসীরা দেবী হয়, তাদের দাম বাড়ে! চুলোয় যাক্। তোমার সত্যি, ধর্ম এসব নিয়ে এবার পথ দ্যাখো। আমার আর ঝামেলায় কাজ নেই। ওই সামনে বড় সদর রাস্তা, এবার তোমার ব্যবস্থা তুমি দেখে নাওগে, আর জড়িয়ো না আমাকে।

তরুবালা বললে—তা বড় রাস্তায় তোমার ভয় কিসের, চলো না একসঙ্গেই যাই।

—আমরা অন্ধকারের মানুষ। যাক সে কথা, তোমার সঙ্গে আলোর মাঝখানে বেরিয়ে শেষে জেল খাটতে হয় যদি! না, তা পারবো না।

জগদীশের এসব কথার অর্থ বুঝতে পারে না তরুবালা। সরল বিস্ময়মাখা চাহনী দিয়ে জগদীশের মুখের দিকে তাকিয়ে, ও বুঝতে চেষ্টা করে।

অধীরভাবে জগদীশ জবাব দিল—বোঝো না! তোমার চেহারাটা আবার ভদ্রঘরের মেয়েদের মতন কি না! সেইটেই মুস্কিল।

তবু তরুবালা ঠিক বুঝতে পারে না, শুধু বলে—ও···

লোকটা যেন কেমন কেমন কথা বলে! মনে হয় এই রহস্যে-ঢাকা মানুষটির মনের গভীরে কোথায় যেন বেদনার স্রোত বইছে। তার কথাবার্তায় যে রুক্ষ নিম্নস্তরের পরিচয়, কিন্তু সেটুকুই ওর সব নয়! এর বাইরে, উর্ধ্বে যেন বৃহৎ সুন্দর একটি মানুষ বাস করে—ওই একই লোকের মধ্যে।

হঠাৎ জগদীশ বললে—দাঁড়াও।

অদূরে বড় সড়কের বাতি দেখা যাচ্ছে। এক-আধজন মানুষ যাচ্ছে আসছে। আর এখানে, এই অন্ধকার পায়ে-চলা একহারা পথে ওরা দু'জন ছাড়া আর তৃতীয় কোনো প্রাণীই যেন নেই।

তরুবালা অবাক হয়ে তাকালো—কি হ'ল আবার!

জগদীশ টর্চলাইট জ্বালিয়ে তরুবালার মাথার ওপর আলো ফেলে দেখল—তারপর আলো নিভিয়ে আত্মগতভাবে বললে—হুঁ!

তরুবালা বল্‌লে—কি ? কি দেখছ ?

—না, সিঁদুর নেই দেখছি ! তবে চলো—

—আমার সিঁথির সিঁদুর থাকলে কি তোমার জেল হ'ত ?

—তা হ'ত ! পরের বৌ চুরির দায়ে পড়তুম।

এ কথায় তরুবালা বেশ খুশি হয়ে হেসে উঠল। বললে—কিন্তু এখন ?

—এখন আর ভাবনা নেই ! ভাববে চরিত্রহীন !

তরুবালার খট্‌কা লাগল। বললে,—চরিত্রহীন ভাববে ? তাহলে বলো, তোমার জন্যে আমারও ওই বদনাম হবে !

জগদীশ চাপা গলায় সকৌতুকে জবাব দিল—আরে মেয়েদের পক্ষে কলঙ্কও একটা বড় অলঙ্কার ! পাঁচটা ইয়ার বন্ধু সুনজরে দেখবে, খোঁজটা-খবরটা রাখবে ! আখেরে বরাতটাই ফিরে যাবে। আমি যে মেয়েছেলে নই ! সেজন্যে হাত কামড়াতে ইচ্ছে করে। ভগবান যদি তোমার মতো আমাকে মেয়ে বানাতো তাহলে দেখতে লাখ টাকা জমিয়ে ফেলতুম !

তরুবালা খুব চটে যায়। উত্তেজিতভাবে ব'লে—তুমি কি বল্‌তে চাও, মেয়েদের সতীত্বের কোনো দাম নেই ?

—আরে ! বিয়ে হ'লে তবে ত সতীত্ব ! তোমার কপালে সিঁদুর নেই, আমারও ঘরে নেই বৌ, তোমার-আমার সতীত্বের কথাই ওঠে না। এ কি কাঁঠালের আমসত্ত্ব, না কি সোনার পাথরবাটী ! সতীত্ব হ'ল কেতাবী কথা।

তরুবালা ধম্‌কে উঠল—থামো এবার। অনেক শুনেছি তোমার কথা। নর্দমার কাদা ছুঁড়ে হোলি খেলার আনন্দ তুমি পাও, তবে

তার মধ্যে আমার কোনো সায় নেই। তুমি স্বচ্ছন্দে চলে যেতে পারো।

তরুবালার কান-মাথা গরম হয়ে উঠেছে। একটু আগেই যে ব্যক্তিকে ওর ভালো মনে হ'তে শুরু হয়েছিল, এক নিমেষে সে ধারণাটা যেন এই বর্বর পা দিয়ে মাড়িয়ে গুঁড়িয়ে দিয়েছে।

জগদীশ ক্ষুণ্ণ অথচ কৌতুকপূর্ণ কণ্ঠে বলে ; যেন শ্লেষ আর বিদ্রূপে মেশানো তার কণ্ঠস্বর—এই ত চাই! তুমি ঠিক পারবে তোমার ব্যবসা চালাতে, বলে গেলুম। আমাকে দিয়ে কাজ হাসিল করে নিয়েছ, এবার আমায় ছেঁটে বাদ দেওয়া দরকার। তা বেশ করেছ। বুঝলে, দুনিয়ার সব মানুষকে মই-এর মতো ব্যবহার করতে শেখাই হ'ল চরম শিক্ষা! মানে, তাতে আখের চড়্‌চড়্‌ ক'রে এগিয়ে আসে। এই সুবুদ্ধিটুকু শেষ পর্যন্ত বজায় রেখে চলতে পারা চাই!

কথা বল্‌তে বল্‌তে বড় সড়কটা পেরিয়ে ওরা সমুখের একটা গলিতে ঢুকে পড়ল।

মুখে চলে যেতে বলেই তরুবালা শঙ্কিত হয়ে উঠেছিল—সত্যি যদি লোকটা এই রাস্তার মাঝখানে ওকে ফেলে রেখে চলে যায়! আড়চোখে জগদীশের মুখের পানে তাকিয়ে তাই আস্তে আস্তে বললে—দিনের বেলা হ'লে আমি একটুও ভাবতুম না। কি কুক্ষণে যে তোমার সঙ্গে দেখা! কে জানতো যে তোমার মতো একটি ওঁছা মানুষের হাতে আমাকে মান খোয়াতে হবে! যাক্, তুমি চলে যাও আমার কপালে যা আছে তাই হবে। ভেবে আর কি করব?

জগদীশ কতকটা স্বগতভাবে বলে—হ্যাঁ, এইবার যাবো।

পথের বাঁ দিকে একটা ঘরের সামনে যুবক দাঁড়ালো। আশপাশে

এক নজর দেখে নিয়ে সে দরজার কড়া নাড়ল—খুড়ো, খুড়ো আছ?

ভিতর থেকে ভাঙা গলায় সাড়া এল—কে? বোষ্টম বাবাজী নাকি?

তরুবালার দিকে তাকিয়ে যুবক হেসে সাড়া দিলে—হ্যাঁ, দরজাটা একবার খোলো তো।

দরজা খুলে আলো হাতে একটি লোক বেরিয়ে এল। তাকে দেখেই তরুবালা আঁতকে উঠে জগদীশের পিছনে জড়োসড়ো হয়ে দাঁড়ালো। লোকটির মুখের একটা পাশে একেবারে মাংস নেই, কিসে যেন থাবা দিয়ে মাংস চেঁছে নিয়েছে। একটা চোখ ঠেলে বেরিয়ে আসছে ব'লে মনে হয়। তরুবালা তার জীবনে এরকম বীভৎস কোনো জীব দেখেনি। ভয়ঙ্কর চেহারার রাক্ষসও যেন এর চেয়ে ঢের ভদ্র চেহারার! তরুবালাকে পলকের মধ্যে দেখে নিয়েছে ওই লোকটা, তার কষ বেয়ে যেন হাসি চুঁয়ে চুঁয়ে পড়ছে তরুবালাকে দেখে।

জগদীশের দিকে তাকিয়ে সে বললে—কোত্থেকে পেলি র‍্যা!

হেসে উত্তর দিল যুবক—পথে কুড়িয়ে।

—আয়, ভেতরে নিয়ে আয়।

অস্থিরভাবে তরুবালা জগদীশের হাত চেপে ধরে বললেন—না, না, এখানে নয়। এখানে আমি কিছুতেই থাকতে পারবো না। এখুনি এখান থেকে চলো।

জগদীশ ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলে—আচ্ছা জ্বালা ত! তোমার জন্যে অর্ডারি জায়গা আমি এখন কোথায় পাই বলো দেখি! রাত

কাটাবার মতো জায়গা চাই বল্লে, তা বেশ ত থাকো খুড়োর এখানে। আর খুড়োর দোকানের রাবড়ী খেতে কী যে মজা। মাটির ভাঁড় চেটে খেতে হবে হ্যাঁ!

তরুবালা ঘন ঘন মাথা নাড়ে আর ওই বীভৎস লোকটার দিকে তাকায়। ভয়ে ওর বুকের মধ্যেটা ভারী হয়ে উঠেছে। না, তরুবালা কিছুতেই থাকতে পারবে না এখানে। তার চেয়ে সারারাত পথের মধ্যে পড়ে থাকবে সেও ভালো। শেয়ালের ডাক, সাপের ভয় কিছুই এখন আর ওর কাছে ভয়ঙ্কর মনে হচ্ছে না।

জগদীশ আবার বলে—চলো, ভেতরে—থাকো।

তরুবালা মিনতিকরুণ স্বরে বললে—না, একা আমি এখানে থাকতে পারবো না। কিছুতেই নয়।

খুড়ো বার বার তরুণী মেয়েটির দিকে তাকায়। বলে—বাঃ, একেবারে মেনিকুকুর! তোর কপালটা চিরকালই ভাল রে! কিন্তু হ'লে হবে কি, পেটিমাছের স্বাদ ত কখনো পেলি নে!

তরুবালাকে আদরের ভঙ্গীতে ডাকলো খুড়ো—এসো, এসো, ঠান্‌দি, লজ্জা কি!

তরুবালা দৃপ্তস্বরে জবাব দিল—আমি ঠান্‌দি নই!

খুড়ো দমবার পাত্র নয়। হেসে উঠল তরুবালার কথায়। যুবকের দিকে চেয়ে বললে—আরে, বেশ ত কুটকুটে! আচ্ছা, সোনাদি এস তোমাকে নয় সোনাদি বলেই ডাকবো! কিচ্ছু ভাবনা নেই।

তরুবালা জগদীশের হাত ধরে টান্‌লো—চলো, এখান থেকে! আঃ—

নিরুপায়, অসহায় জগদীশ! এতক্ষণ যদি বা তরুবালাকে দু-দশ কথা শুনিয়ে এসেছে, এখন আর পারে না। তরুবালার হাতের স্পর্শ যেন ভারি মিষ্টি। সে নিজের অজ্ঞাতে কোথায় যেন আকর্ষণের জালে আটকে পড়েছে। খুড়োর দিকে তাকিয়ে বললে সে—ওই নাও আজ রাতটাই বরবাদ, বুঝলে খুড়ো।

খুড়ো গম্ভীরভাবে প্রশ্ন করে—ভদ্রলোকের মেয়ে বুঝি?

জগদীশ ভ্রূভঙ্গী ক'রে বলে—বলে ত তাই। আর তাতেই হয়েছে বিপদ। মান বাঁচাও, সম্ভ্রম রাখো, সতীত্ব যেন ঠিক থাকে। আরে বাবা, বিস্তর বায়নাক্কা। আমি বলি যে, আজ নয় বাঁচলো, কিন্তু কাল কি হবে? কাঁচের গেলাসের জন্মই হ'ল ভাঙবার জন্যে।

তরুবালার দিকে নজর পড়তেই জগদীশ বিব্রতভাবে বলে—আচ্ছা, চলি ভাই খুড়ো। আবার দেখা হবে—

খুড়ো গমনোদ্যত জগদীশের হাত ধরে টেনে কাছে সরিয়ে নিয়ে এসে কানে কানে বলে—হতভাগা, বেচে দে। মোটা টাকা পাবি! বোকামী করিস নে এমন সওদা ত হরবখত পাবি নে!

জগদীশ বিজ্ঞভাবে বলে—সে চেষ্টার কি কসুর আছে। তক্কে তক্কে আছি। তারপর উচ্চকণ্ঠে সে বললে—তা ছাখো খুড়ো, তোমার দোকান ঘরটা খুলে দিতে পারো?

—তা পারি, কিন্তু তোমার যা হাতযশ—রাতে যদি তবিল ভেঙে পালাস?

জগদীশ হেসে বললে—আরে আমার জন্য নয়, আমি কোন দুঃখে তোমার দোকানে থাকতে গেলুম। এই মেয়েটার জন্য বলেছিলুম।

তরুবালা ঠোঁট কামড়ে বিচিত্র ভঙ্গীতে বলে—গালই দাও আর

মন্দই বলো, আমি সাফ বলে দিচ্ছি, এই রাক্ষসের খপ্পরে আমি একা কিছুতেই থাকবো না।

জগদীশ বিরক্ত হ'য়ে বললে—থাকবে না, তা, কি করবে শুনি?

—তোমার পিছু পিছু যাবো!

এবার জগদীশ রীতিমত চটে যায়—বটে এখন বুঝতে পারছি, যেসব হতভাগাকে তোমার মতো সতী সাবিত্রী নিয়ে ঘর করতে হয় তাদের কত জ্বালা!

খুড়ো খল্‌খলিয়ে হেসে ওঠে। সব কটা দাঁত বার করে বলে—তা যা বলিছিস জগা! একেবারে মাথার উকুন, ছাড়ালেও ছাড়ে না!

আ়ঃচোখে তরুবালার দিকে তাকিয়ে জগদীশের উদ্দেশে খুড়ো বলে—কি বলিস, দেবো খুলে দোকান ঘর?

জগদীশ এবার বলে—যদি তোমার তবিল ভাঙি?

খুড়ো হাসতে হাসতে বলে—সঙ্গে তোর এরকম জলজ্যান্ত টগবগে সতী সাবিত্রী, তবিলের দিকে নজর দেবার মন কোথায় পাবি র‍্যা! খাশা জম্‌বে এঁ্যা! দাঁড়া চাবি নিয়ে আসি।

খুড়ো চলে যেতেই তরুবালা বললে—ঘুমিয়ে পড়লে ফেলে পালাবে না ত?

জগদীশ রীতিমত অস্বস্তির মধ্যে পড়েছে। তরুবালার কথায় ঝাঁঝিয়ে জবাব দিল—দোহাই, আর কাটা ঘায়ে নুনের ঝাপ্‌টা মেরো না। আমার যা লোকসান হ'ল তা আমিই জানি। তোমাকে দু-বার বেচলেও সে টাকা উশুল হবে না।

চাবি হাতে করে খুড়ো বেরিয়ে এসে দেখল. ওরা কথা বল্‌ছে।

আপন মনেই বললে—খাশা মানিয়েছে। ছোটলোক হ'লে কি হয়, ছোঁড়ার চ্যায়রাখানা খানদানী!

ওদের কাছে এসে জগদীশের হাতে চাবিটা দিয়ে বললে—দেখিস, সাবধান। খুট করে দোর খুলবি, ময়রানী না টের পায়। মাগী ভারি শয়তান! আর ত্থাখ, ভোর হতে-না-হতে সরে পড়িস কিন্তু—চাবিটা রেখে যাস ওই দরজার গোড়ায়। কেমন—

দরজা খুলতেই খুড়ো ঘরে ঢুকে আলো জ্বেলে দিয়ে পা টিপে টিপে বেরিয়ে গেল। দোর গোড়ায় গিয়ে একবার ফিরে তাকিয়ে তরুবালাকে বেশ ভালো ভাবে দেখে নিল।

তরুবালা সামনেই চৌকি দেখে তার ওপর ধপাস ক'রে বসে পড়ল। শব্দ হ'তেই ভীত চকিত দৃষ্টিতে জগদীশ তাকালো। চোখের ইশারায় তরুবালাকে সে সাবধান করে দিতে চাইল।

তরুবালা এবার খানিকটা নিশ্চিন্ত হতে পেরেছে। ও বললে—লোকটা মোটের ওপর মন্দ নয়। কিন্তু চেহারা দেখে বুক কেঁপে ওঠে। আচ্ছা, তোমাকে ওই বোষ্টম বললে কেন?

জগদীশ একটু হেসে বললেন—নেশাভাঙ করি নে, তাই।

তরুবালা প্রশ্ন করল—কোনও বদ অভ্যাস নেই।

জগদীশ গম্ভীর ভাবে জবাব দেয়—অত জানবার জন্ত ব্যস্ত কেন বল্‌তো। মতলবটা কি?

তরুবালা অনেকক্ষণ পরে যেন নিজের হারানো পরিহাসপ্রিয়তাকে ফিরে পেয়েছে। চোখদুটো সকৌতুকে নাচিয়ে বললে - কেন? ভয় পেলে?

জগদীশ মাথা নেড়ে জবাব দিল—ভয়? প্রথমে পেয়েছিলুম—

কিন্তু এতক্ষণে টের পেয়ে গেছি, তুমি আমাকে অন্যভাবে জব্দ করতে চাও!

তরুবালা গম্ভীরভাবে বলে—তোমাকে জব্দ করব আমি! যে লোকটা গাঁজা-আফিং-কোকেনের চোরা কারবার করে, টাকা পেলেই মেয়েমানুষকে বেচে দেয়—আবার এদিকে নেশাও করে না, মেয়েছেলের দিকে তাকায় না, তাকে আমি কি জব্দ করব!

জগদীশ ঘরখানার এপাশ ওপাশ ভালো ক'রে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে ছাখে, কতকটা আপন মনেই সে বলে—কিন্তু তা নয়! আমি ভাবছি, এটা কি করে হলো?

তরুবালা সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকায়—কি আবার হ'ল?

—এই আমার ভাবগতিক দেখে অবাক হচ্ছি আর কি! জীবনে কোনো মেয়ের সঙ্গে এতো কথা আমি বলিনি—বল্‌তে পারি তাও জানতাম না।

তরুবালা গম্ভীরভাবে জবাব দিল—হুঁ!

জগদীশ ভ্রূকুঞ্চিত করল—হুঁ মানে?

—এ ত খুব সোজা জবাব। জীবনে কখনো ভদ্রঘরের মেয়ে ছাখোনি।

—কথাটা যে মিথ্যে বলেছ তা নয়। মেয়ে ত কম দেখিনি, কিন্তু ওই ভদ্র কি অভদ্র তা নিয়ে মাথা ঘামাই নি কখনো।

জগদীশের মুখের দিকে তরুবালা এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে। তার কথাগুলো যেন চোখ মেলে দেখছে, না কি আরও কিছু? তরুবালা নিজেও ঠিক বুঝে উঠতে পারে না। জীবনে তরুবালা কখনও এরকম স্বাধীনভাবে কোনো পুরুষ মানুষের সঙ্গে

মেশে নি। আজ ওর এক আশ্চর্য অভিজ্ঞতা•হ'ল! একেবারে নিজের উপর ষোলো আনা নির্ভর করার অনুভূতি যে এত বিচিত্র, এত বিস্ময়কর, তরুবালা কয়েক ঘণ্টা আগে ত জানতো না। এখন ওর মনে হচ্ছে, পৃথিবীর সঙ্গে ওর এমন একটা বিশিষ্ট সম্পর্ক গড়ে উঠেছে যার দায়িত্ব সামান্য নয়। ন্যায়-অন্যায়ের নিরীখ তরুবালাকেই স্থির করতে হবে। ওর হ'য়ে কেউ এই সূক্ষ্ম বিচারটুকু ক'রে দেবে না। তেমনি আর সবকিছুরই ভার তরুবালার নিজের উপর। আশ্চর্য এই স্বাধীনতার স্বাদ!

হঠাৎ ওর মনে হ'ল, জগদীশের প্রতি ওর কিছু কর্তব্য আছে। জগদীশকে ও বললে—জানি, আমার জন্য তোমার লোকসান হয়েছে অনেক। আজকের রোজগারটাই তোমার মাটি করে দিয়েছি। তার বদলে, এই টাকা ক'টা তুমি নাও।

এ কথায় জগদীশের মুখে হাসি ফুটলো। টাকার ওপর তার সাংঘাতিক আকর্ষণ।· জগতের আর সব কিছুই জগদীশ উপেক্ষা করতে পারে, কিন্তু টাকার নেশা সে কিছুতেই কাটাতে পারবে না। সে হাত পেতে তরুবালার দেওয়া টাকাগুলো নিয়ে, চুমো খেয়ে পকেটে রাখলো—বাঁচালে বাবা, আজকের এই প্রথম বউনি!

পরক্ষণে কি মনে ক'রে সন্দিগ্ধভাবে তরুবালার মুখের পানে তাকালো জগদীশ, .বললে—কিন্তু মেয়েছেলেকে বিশ্বাস নেই। ঘুমিয়ে পড়লে যেন পকেট মেরে নিয়ো না - তাহলে আর মেয়েছেলে ব'লে রেয়াৎ করব না। বুঝলে?

তরুবালা খিল্-খিল্ ক'রে হেসে উঠল—টাকা বুঝি খুব ভালোবাসো?

—ও ছাড়া আর কি আছে ভালোবাসার ?

তরুবালা দীর্ঘশ্বাস ফেল্‌ল—কিছু নেই ?

—না।

—কিচ্ছুই না ?

—জানো না বুঝি ? ন্যাকামি করছ কেন জেনেশুনে !

তরুবালা নিজের কথাগুলো বেশ ওজন করে বল্‌ছে। ওর এখন মনে হচ্ছে যে, ছেলেমানুষী করা ওর সাজে না—পৃথিবীতে ও যে একা ! হ্যাঁ, তা ছাড়া আর কি ? ফিরে যাবে না—না, কোথাও যাবে না তরুবালা। পিতামাতার খেয়ালের খেলনা হওয়ার চেয়ে নিজের হাতের খেলনা হওয়ার মধ্যে অনেক বেশী আত্মপ্রসাদ আছে। ও ধীরে ধীরে চৌকীর ওপর গা ঢেলে দিয়ে বলে—আচ্ছা, তুমি টাকার জন্মে লোকের পকেট মারতে পারো ? চুরি, ডাকাতি, রাহাজানি—সবকিছু করতে পারো ?

জগদীশ মাথা নাড়ে—না, আমি জোচ্চুরি বরদাস্ত করতে পারিনে ! সোজাসুজি হাত বদলে—যাকে বলে ডান হাত বাঁ হাতের ব্যাপার আমি তাই বুঝি। এর মধ্যে লোক ঠকানোর বালাই নেই। চুরি ডাকাতি ত নোংরা কাজ !

তরুবালা হাসলো—তাহলে তোমারও একটা আদর্শবাদ নীতি রয়েছে ?

জগদীশ হাই তুলে নিজেই তুড়ি দিল। তারপর চৌকির একপাশে কোনোরকমে কুণ্ঠিত ভাবে শুয়ে পড়ল। বললে—উঃ এখানে কি মশা ?

তরুবালা তার দিকে তাকিয়ে বলে—তা হবে।

উঠে বসল জগদীশ—কই ঘুমোলে না ত! ঘুম আসছে না বুঝি? নাকি টাকা ক'টা দিয়ে ফেলে এখন মনে মনে পস্তাচ্ছো? জানি! মেয়েমানুষের প্রাণের চেয়ে পয়সার মায়া বেশী! তার জন্যে কি আছে—আচ্ছা, এই নাও।

জগদীশ পকেট হাতড়ে একটা কাঁচা টাকা বার ক'রে তরুবালার হাতে দিল।

তরুবালা খুব চটে গিয়েছে। যেন এই লোকটা ওকে অপমান করছে, নইলে এভাবে একটা টাকা দিয়ে ভোলাতে আসবে কেন? রাগের মাথায় তরুবালা মুদ্রাটা হাত থেকে ছুড়ে ফেলে দিল। মেঝেয় পড়ে টাকাটা শব্দ ক'রে ওঠে 'ঠন্', তারপর খানিকটা গড়িয়ে গিয়ে দেওয়ালে ধাক্কা খেয়ে আর একবার আওয়াজ ক'রে থেমে গেল।

জগদীশ কোনো কথা বলবার আগে, তরুবালা রাগে ফেটে পড়বারও আগে—ওদের দুজনকে ধমকে দিয়ে খ্যান্-খ্যানে গলায় পাশের ঘর থেকে সাড়া এল—দোকানে কে র্যা—এ্যাঁ? বলি কে?

জগদীশ ব্যস্ত হয়ে পড়ল। তাড়াতাড়ি উঠে সে আলোটা নিভোতে গিয়ে বিপদ আরও ঘুলিয়ে তুল্‌ল। চৌকিটা তার দেহের আলোড়নে মট্ মট্ শব্দ ক'রে জানিয়ে দিল যে এ ঘরে 'কেউ' রয়েছে।

ময়রানীর পায়ের শব্দ পেয়েই জগদীশ চট্ করে চৌকির তলায় ঢুকে পড়ল। তরুবালা ভয়ে জড়োসড়ো হয়ে বসে রইল—চৌকির ওপর। কপালে যে কি আছে কে জানে?

জুয়া

দুই ঘরের মাঝের দরজা   লো হাতে নিয়ে দোকান ঘরে ঢুকেই ময়রা বৌ তরুবালাকে দেখে প্রথমে মিনিট খানেক 'থ' হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর হঠাৎ অগ্নিবর্ষণ শুরু করল—অঃ, ওই জন্যে মিন্‌ষের রাতদুপুরে বাইরে দাঁড়িয়ে ফিস্‌ফিস্‌নি! নচ্ছার বদমায়েস—তরুবালা এরকম নর্তনকুর্দন দেখতে অভ্যস্ত নয়। ময়রানীর অঙ্গভঙ্গী দেখে ওর খুব হাসি পাচ্ছে। আবার ভয়ও হচ্ছে, মেয়েমানুষটার নাকে ইয়া একটা নথ্, আবার বাঁহাতে একখানা বাঁশের লাঠি—যদি দু-ঘা বসিয়েই দেয়!

তরুবালার দিকে তাকিয়ে বল্‌লে ময়রানী—তা তোকে কোত্থেকে এখেনে এনেছে লা?

তরুবালা এবার অপমানিত বোধ করে। ময়রানীর কথার মধ্যে এমন একটা ঘৃণ্য তাচ্ছিল্য ফুটে উঠেছে যা তরুবালার কাছে দুঃসহ। সহসা তপ্তকণ্ঠে সে বলে—একটু ভালো ক'রে কথা বলো না।

মুখ বিকৃত করে ময়রানী টেনে টেনে বলে—রাত দুপুরে আমার দোকানে ঢুকে আবার আমারই মুখের ওপর কথা। মেয়েমান্‌ষের জাত। বলি উদিকে ময়রা মিন্‌ষে ত ঘুমুচ্ছে। তা তুই এখেনে বসে রইচিস কোন মতলবে? বলি পুরুষ পাকড়াবি বলে বসে রইচিস না তবিল ভাঙবার তালে রইচিস। এই ছুঁড়ি, কথার জবাব দে না।

তরুবালা জবাব দিল—কি হয়েছে কি?

ময়রাবৌ মুখ ভেংচে বলে—বলি, তুই জ্বালে টোকা দিয়ে আমার সোয়ামীকে ডাকছিলি নে? আমি কি ঘাস খাই, কিছু বুঝিনে।

বলি তক্তাপোষে তব্‌লা বাজিয়ে মিন্‌ষেকে ইশারা ক'রে, আবার ভালমান্‌ষি হচ্ছে।

তরুবালা যখন ময়রানীর সঙ্গে কথাবার্তায় ব্যস্ত তখন ওদিকে চৌকির তলা থেকে একখানা হাত বেরিয়ে এসে বারকোষের ওপর থেকে খানকতক কচুরী তুলে নিল।

ময়রাবৌএর কথার জবাবে তরুবালাও সমান মেজাজে উত্তর দেয়—তোমার ঘর, তুমি হাতে পেয়ে যা খুশি গালাগাল দিতে পারো। কিন্তু তোমার ওই বুড়োহাবড়া সোয়ামীর ওপর আমার কেন, কোনো মেয়েরই লোভ থাকতে পারে না। কি করব, নিরুপায় হয়ে কোথাও জায়গা না পেয়ে এখানে আশ্রয় নিয়েছি।

নিজের গালে ঠোনা মেরে ময়রা বৌ বলে—আহা রে, মরে যাই আর কি। ন্যাকা সাজা হচ্ছে? বলি তোকে এ ঘরের চাবি কে খুলে দিইছিল, ময়রা মিন্‌ষের পেটে পেটে কুচুক্কুরে পাক, তা আর জানি নে। আমিও পদী ময়রানী, মিন্‌ষের কাপড়ের খুঁটে আঁচলের গেঁরো বেঁধে শুইছি আজ। সব জানি, সব বুঝি। বেরোও বল্‌ছি—এখুনি বিদেয় হও—

তরুবালার দিকে তর্জনী তুলে ময়রাবৌ বাইরের দরজা দেখিয়ে বলে।

তরুবালা বলে—দয়া ক'রে রাত দুপুরে চেঁচামেচি ক'র না। আমি যাচ্ছি—

—হ্যাঁ। যাও, তাই যাও। উঃ, যার ধন তার ধন নয়, নেপোয় মারে দই। যাও, নিকালো—

তরুবালা বিষণ্ণ, বিরক্ত মুখে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। পরক্ষণে ময়রাবৌ ভেতর থেকে দরজার খিল এঁটে দিল।

কি করবে? কোথায় যাবে তরুবালা? আর, জগদীশেরই বা কি অবস্থা? সে কি সারারাত এই চৌকির নীচে নির্বিকার ভাবে পড়ে থাকবে? আশ্চর্য লোক বটে,—কেমন বিপদের মুখে তরুবালাকে এগিয়ে দিয়ে নিজে নিশ্চিন্তভাবে গা-ঢাকা দিয়ে রইল।

॥ সাত ॥

অন্ধকারের মধ্যে তরুবালা মাটিতে বসে পড়ল। বাস্তবিক, এ আশ্চর্য জগৎ। তার সমস্ত জ্ঞান আর বুদ্ধি, ধ্যান আর ধারণার বাইরে। হঠাৎ সে এসে পড়েছে কুটিল এক ময়লা জগতে,—যেটা সভাসমাজের কাছে রহস্যাবৃত। বিকারে ধিক্কারে নোংরায় বীভৎস এই জগৎ। তরুবালা বুঝি এতকাল দূর থেকেই পৃথিবীকে দেখেছে, চেনে নি, জানে নি, বোঝে নি কিছুই? আজকের এই একটি রাতেও এত অসংখ্য বিচিত্র অভিজ্ঞতা ওর ভাগ্যে জুটেছে যে, এরপর আর যেন সম্ভব অসম্ভব ব'লে আলাদা কিছু বাকী থাকতে পারে না। এই মুহূর্তে তরুবালা বুঝতে পারে যে, দুনিয়াতে সবরকম অকল্পনীয়ই সম্ভব। নইলে ওই জগদীশ কি ক'রে নিজেকে গায়েব করল? আর ওই ময়রাবৌই বা কি ক'রে বিশ্বাস করতে পারে যে তরুবালার মতো একটি মেয়ের লোভ পড়তে পারে ওই বৃদ্ধ কদাকার বিকৃত মুখ মানুষটার উপর?

তরুবালা নিজের মনে ভাবনার জাল বুনে চলেছে। এখন আর ওর চোখে ঘুম নেই। নেই ওর প্রাণের ভয়। তরুবালার সমগ্র সত্তা যেন সমাজের এই অদ্ভুত পৃথিবীটার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে

উঠেছে। তার দাবি, মানুষের কাছ থেকে মানুষের মত আচরণ। যে শিক্ষা এবং বিশ্বাসের উপর এতকাল তরুবালার জীবনটা বেড়ে উঠেছে—আজকের এই ঘটনাপ্রবাহ যেন সেই বিশ্বাস, শিক্ষা, নীতিবোধের মর্মমূলে কুঠারাঘাত করেছে।

কখন যে জগদীশ দোকান ঘরের খিল খুলে বেরিয়ে এসে তরুবালার পাশে দাঁড়িয়েছে, ওকে নাম ধরে ডেকেছে কিছুই টের পায় নি তরুবালা। জগদীশ গলার সাড়া দিতেই ও চম্‌কে উঠ্‌ল—কে?

শান্ত কণ্ঠে জগদীশ বলে—কি? বসে বসে ঘুমোচ্ছিলে নাকি?

তরুবালা বিরস কণ্ঠে জবাব দিল—ও, তুমি।

জগদীশ ব্যস্তভাবে বললে—নাও, চলো। খুড়ি একেবারে ঘাম বার ক'রে দিয়েছে। আর তেমনি শালার মশাদের বাঁদ্‌রামি। আচ্ছা কামড়েছে।

তরুবালা তিক্তকণ্ঠে প্রশ্ন করে—মান-অপমানের ভয় নেই তোমার? শুধু মশার কামড়টাই টের পাও।

সিগারেট ধরিয়ে ধোঁয়া ছেড়ে হাল্কা সুরে জগদীশ জবাব দিল—যাদের মানুষ মনে করি নে, তারা দুটো কড়া কথা বল্‌লে কি এসে যায়? আর তোমারই বা কি, সত্যি তোমার ত কোনো দোষ নেই? তবে আর কেন মিথ্যে গা জ্বালা।

তরুবালা মাথা নেড়ে প্রতিবাদ করল—আছে বৈ কি, ময়রাবৌকে না জানিয়ে তুমি আমাকে ওর ঘরে তুলেছিলে কেন?

সশব্দে জগদীশ হেসে উঠলো,—তোমার বোকামী দেখে এখন সন্দেহ হচ্ছে, তুমি সত্যি বুঝি ভদ্রঘরের মেয়ে। আরে বাপু, আমি

বুঝি ওকে বল্‌তে যাবো যে—খুড়ি তোমার ঘরে আমি মেয়েছেলে এনে তুলেছি? তাহলে বুঝি ওর হাতে তোমার মান থাকতো?

তরুবালা তবুও বোঝে না। জগদীশের সঙ্গে এই ক'ঘণ্টা কাটিয়ে বুঝে নিয়েছে যে, জগদীশ তথাকথিত চরিত্রহীন নয়। আর ও যদি বুঝে থাকে ত যারা এতদিন জগদীশকে দেখছে তারা কি এটুকু বোঝে নি।

তরুবালা বললে—কিন্তু তুমি ত সেরকম লোক নও।

রাতের আবছা আলোতে জগদীশ তরুবালার মুখের দিকে তাকিয়ে বলে—বাঘ এখনো রক্তের স্বাদ পায়নি বটে। কিন্তু বাঘের স্বভাব যে মানুষ খাওয়া, তা জানো। ব'লে সে তরুবালার দিকে ডান হাতখানা বাড়িয়ে দিল—নাও, ধরো।

এবার তরুবালা বিস্মিত দৃষ্টিতে জগদীশের দিকে চাইল। তার হাতে দু-খানা কচুরী। হাত পেতে একখানা কচুরী নিল তরুবালা—কোথায় পেলে?

জগদীশ আপন মনে কচুরী চিবোচ্ছে, ওর কথার জবাব দিল না।

তরুবালা মনে মনে খুশি হয়েছে। খিদে যা পেয়েছে তাতে একখানা কচুরী কিছুই নয়—কিন্তু এই কচুরীখানার মধ্যে যে স্নেহের স্বাদ মাখানো রয়েছে তা অসামান্য।

জগদীশ বললে—চলো!

তরুবালা প্রশ্ন করে না,—কোথায়? কেন? এখন যেন চলাটাই ওর এই রাত্রির একমাত্র অবলম্বন। আর জগদীশই হচ্ছে ওর অদ্বিতীয় সঙ্গী। বিনা দ্বিধায় তরুবালা চল্‌তে লাগলো।

একটি বাগানের সামনে এসে জগদীশ দাঁড়িয়ে পড়ল।

তরুবালা প্রশ্ন করে—থামলে যে ?

—আচ্ছা মুস্কিল হয়েছে। তোমাকে নিয়ে এইভাবে সারা রাত ঘুরে মরব নাকি ? আমার হয়েছে উড়ো ফ্যাসাদ।

—ফ্যাসাদ আর কি, কোথাও ফেলে চলে যাও—?

—তাই ভাবছি। কোথায় তোমায় গছানো যায়।

—আর কোনো নোংরা জায়গা মনে পড়ছে না ?

জগদীশ দাঁতে দাঁত চেপে রুষ্টকণ্ঠে জবাব দিল—তোমার উপযুক্ত নোংরা জায়গা আমি পাই কোথায় !

তরুবালা হাসিতে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে। জগদীশের মুখের দিকে তাকিয়ে ওর কেমন যেন মায়া জাগে। মৃদু মিষ্টি স্বরে বললে—ছি, মেয়েছেলে বিপদে পড়ে যদি দুটো মন্দ কথা বলে তাতে কি রাগ করলে চলে ? চলো না ওই বাগানে গিয়ে বসি আমরা !

জগদীশ বললে—তারপর, গেরস্ত যদি পুলিশ ডাকে তখন তুমি আবার আমাকে ফাঁসিয়ে দেবে না ত ?

বল্‌তে বল্‌তে জগদীশ বাগানে ঢুকে পড়ল। তরুবালা নরম ঘাসের ওপর খুশিতে গা ঢেলে দিয়ে বসল। জগদীশ তার কাছে বসে একবার তাকাতেই নজর পড়ল তরুবালার হাতের বটুয়ার ওপর। সে প্রশ্ন করল—ওটা তোমার হাতে কি ?

তরুবালা বললে—টাকা।

জগদীশ বিস্মিত হ'ল—টাকা! তখন যে আমাকে দিলে, টাকা! ব'লেই সে নিজের পকেট হাতড়াতে শুরু করল।

হেসে উঠল তরুবালা—না, না, তোমার পকেট মারি নি। এটা

আমার পুঁজি। বা রে, একটু আগে তুমিই না বল্‌লে, মেয়েছেলে পুঁজি ছাড়ে না!

আশ্বস্ত হয়ে জগদীশ পকেট থেকে হাত বার ক'রে নিল। তারপর বেশ উৎসুকভাবেই প্রশ্ন করল—তুমি বুঝি বড়লোকের মেয়ে?

তরুবালা ঘাড় দুলিয়ে কথাটা এড়িয়ে যেতে চেষ্টা করে, বলে—যদি বলি যে চুরি করে এনেছি?

অবিশ্বাসের দৃঢ়তা জগদীশের স্বরে প্রকাশ পায়—না, তা হতেই পারে না। চুরি তোমার দ্বারা হবে না। আর তার দরকারই বা কি, তোমার চেহারাটা বেচলেই ত ল্যাঠা চুকে যায়। খামোখা চুরি ক'রে বিপদে পড়তেই বা যাবে কেন তুমি?

তরুবালা সকৌতুকে কথা বল্‌ছে, ওর চঞ্চল চোখ দুটো খঞ্জন পাখীর মতো নাচিয়ে বললে,—আচ্ছা বলো তো, কত টাকায় নিজেকে বেচতে পারি?

এ কথায় যেন জগদীশের মন উল্লসিত হয়ে ওঠে। টাকা! হ্যাঁ, তরুবালা যদি সত্যি এরকম কোনো মতলব আঁটে তাহলে জগদীশ দালালী ক'রে মোটামুটি রোজগার করতে পারে। টাকার গন্ধে জগদীশ যেমন উত্তেজিত হয়, তেমন আর কিছুতে নয়। সে বেশ পাটোয়ারী ভঙ্গীতে বলে—আমাকে যদি আধাআধি বখরা দাও, মোটা টাকায় তোমায় বেচতে পারি। খদ্দেরের অভাব কি! আরে অনেক তা বড় তা বড় লোক আনাচে কানাচে লুকিয়ে আছে। আমার কাছে কোকেন কেনে,—তোমাকে যদি তাদের কাছে ফেলি ত বাজিমাৎ। তাজা ধড়ফড়ে মাছ মওকা বুঝে দর হাঁকবো।

তরুবালার এসব ভালো লাগে না। রসিকতা করতে গিয়ে এ

আবার নতুন ফ্যাসাদ হ'ল। লোকটার কি সত্যিই মাথা খারাপ—নাকি সে যা বল্‌ছে তাই সম্ভব! তরুবালা বিরক্তিভরে বলে—হয়েছে চুপ করো। খুব বাহাদুর তুমি।

জগদীশ দমে না—আরে, ভালো মেয়েছেলের যে অনেক দাম তা কি বুঝিনে! তবে টাকার দাম তার চেয়েও বেশি, তা জানো?

তরুবালা ধমক দিল—জানি। তোমার দৌড় ত দেখলাম। মুখেই কেবল রাজা উজীর মারতে পারো। করো তো কোকেনের চোরা কারবার, তার বড়াই করছ কিসের। এতই যদি রাজারাজড়া তোমার হাতে তবে একটা রাতের মত আমার মাথা গোঁজার ঠাঁই জোটে না কেন?

জগদীশ ভ্রূকুঞ্চিত করে। মেয়েটা আচ্ছা মুস্কিলে ফেলেছে তাকে। কোনো একটা কাজে আসবার মতলব এর নেই। সগু সগু রোজগারের গোড়াতে ছাই পড়াতে সে রীতিমত ক্ষুব্ধ! তেমনি চড়া মেজাজেই বললে—তুমি যে কাঁধে ভর করবে তা কি জানতুম? তাছাড়া মেয়েছেলে এতো কাছে আমি কখনো দেখিনি!

তরুবালা শান্ত হয়। জগদীশের অসহায় অবস্থাটা ও বেশ অনুভব করে। তবু যেন ঠোঁটের ডগায় ওর চোখা কথার ভিড় জমেছে, ও সামলাতে পারছে না নিজের কথার কৌতুককে। ও বলেই চল্‌ল—তুমি কাছেও দেখো নি, দূরেও দেখো নি। আসলে দেখার মতো চোখই তোমার নেই। শুধু কি টানাটানা বড় চোখ থাকলেই দেখতে পাওয়া যায়! থাকা চাই মন। আর তোমার মন মাছির মত টাকার ওপরই পড়ে আছে সর্বক্ষণ। তাই, মেয়েদের নিয়ে কেনা-বেচাই

ক'রেছ—তাদের প্রাণ পদার্থের দিকে কোনোদিন দৃষ্টি পড়ে নি! কেমন সত্যি বলি নি ?

জগদীশ রাগ করল না। হেসে বললে--মিথ্যে বলো নি। কিন্তু আমি টাকা পাই সেটা বুঝি তোমার ইচ্ছে নয়।

তরুবালা হতাশ কণ্ঠে বলে—হা ভগবান !

জগদীশ এবার বিজ্ঞভাবে বললে—বুঝিছি। তোমার মতলব ভালো নয়। সেই থেকে আমার কানে বিষ ঢালছো। কিন্তু অত সহজে এ ভবী ভোলবার নয়। নাও, এখন এখান থেকে শেকড় কাটো। ওসব তোতাপাখীর মিহি বুলি আমার শোনা আছে। এসো।—

ব্যস্তভাবে জগদীশ গা ঝাড়া দিয়ে উঠে পড়ল। তার কেমন যেন সন্দেহ হয়েছে তরুবালা আর কিছুই চায় না, ওর মতলব জগদীশের কাঁধে ভর করা। না, সে তা হ'তে দেবে না।

তরুবালা জবাব দিল—না, উঠবো না—

জগদীশ চমকে উঠল। মেয়েটা বলে কি ? সে ঘুরে দাঁড়ালো —কি করবে এখানে ?

তরুবালা তেমনি চড়া স্বরে জবাব দিল—দেবো, তোমায় পুলিশে ধরিয়ে দেবো।

জগদীশ সত্যিই ভয় পেয়েছে। ভয়ার্ত দৃষ্টিতে সে এদিক-ওদিক দেখে নিল। নিমেষে তার দু-চোখে হিংস্রতা ফুটে উঠল। হ্যাঁ, সে প্রয়োজন হলে সব কিছুই করতে পারে।

তরুবালার দিকে জলন্ত দৃষ্টি ফেলে সে বললে—তোমার চাতুরী এবার বুঝেছি। কিন্তু আমাকে ধরিয়ে দিলে তুমিই কি বাঁচবে ভেবেছো ?

ব্যস্তভাবে সে পকেটের মধ্যে হাত চালিয়ে কি যেন অনুভব করে। হ্যাঁ, ঠিক আছে। বিপদের বন্ধু তার পকেটে শান্ত প্রতীক্ষা নিয়ে বসে আছে।

তরুবালা এতটুকু বিচলিত নয়। ও যেন এক আশ্চর্য শক্তির সন্ধান খুঁজে পেয়েছ নিজের মধ্যে। জীবনে কখনো খুনী স্বচক্ষে দেখেনি তরুবালা – তবু এই মুহূর্তে সহজাত বুদ্ধি দিয়ে বুঝতে পারে জগদীশের চোখের মধ্যে খুনীর ছায়া। কিন্তু তরুবালা আসলে নারী। নারী রহস্যময়ী। সেই রহস্যের সন্ধান একমাত্র মেয়েদের মনের গহনেই থাকে। ও একটুও ভয় পেল না জগদীশকে দেখে, হাসতে হাসতে বললে—পকেটে হাত দিচ্ছ। ছুরি মারবে বুঝি?

জগদীশ বেশ সপ্রতিভভাবেই জবাব দিল—হ্যাঁ, এ্যাটাচি কেস্‌টা সঙ্গে আছে! আমাকে বাঁচতে হবে! এর অনেক দাম।

তরুবালা বললে—বেশ ত, এখানে কেউ নেই, জানবে না কেউ! কিন্তু দেখো আবার কাঁচা কাজ ক'রে আমাকে ভুগিয়ো না! এমন ভাবে মারো যাতে এক্ষুণি মরি! আর তোমার যেন কোনো বিপদ না হয়!

এ রকম অদ্ভুত ধরণের কথা জগদীশ কখনো শোনেনি। অবাক হয়ে প্রশ্ন করে—নিজেই যদি মরতে চাও, ত আমাকে পুলিশে ধরিয়ে দিয়ে তোমার কি লাভ?

তরুবালা বলে – লাভ? তোমার শাস্তি হ'ল, এই ত লাভ!

—আমি জেল খাটলে তোমার কি লাভ! তা ত বুঝলাম না।

—সেটুকু যদি বুঝতে তাহলে আর ভাবনা কি ছিল!

হতাশ ভঙ্গীতে তরুবালা যেন ভেঙে পড়ে।

জগদীশ আকাশের দিকে তাকিয়ে বলে—কিন্তু তুমি মরলে ত আমি বেঁচেই যাবো, শাস্তি দেবে কে ?

তরুবালা হেসে উঠল, তরল উচ্ছল নয় এ হাসি—এ হাসির মধ্যে গভীর একটা রহস্য ঢাকা রয়েছে ! শান্ত, বিষণ্ণতায় এ হাসি ম্লান। তরুবালা তেমনি ঠাণ্ডা গলায় বলে—আমিই দেবো। আমার মৃত্যু দিয়ে তোমার শাস্তির শুরু হবে।

জগদীশ তবু বুঝতে পারে না তরুবালার কথা, প্রশ্ন করে—কেমন করে ?

তরুবালা অপলক দৃষ্টি মেলে দিয়ে তাকিয়ে থাকে জগদীশের দিকে। ওর মন যেন অতলান্ত সমুদ্র ! মুখের ওপর রহস্যময় প্রসন্নতার ব্যাপ্তি। তরুবালা শান্ত কণ্ঠে কথা বলে—নিরপরাধকে খুন করেছ, এই স্মৃতিটা তোমার সারাটা জীবন সঙ্গী হয়ে ঘুরবে। বুঝলে, ভূতের মতো তোমাকে শয়নে স্বপনে অস্থির করে রাখবে এই অকারণ নারী-হত্যার স্মৃতি। হাজার চেষ্টা করলেও তা মুছতে পারবে না। ধর্মশালা ক'রে, পিঁপড়েকে চিনি গিলিয়েও তোমার নিজের কাছ থেকে পরিত্রাণ হবে না।

জগদীশ স্তব্ধ হয়ে তরুবালার মুখের পানে চেয়ে থাকে। তার দু চোখে বিস্ময়ের অবধি নেই ! সে যেন বুঝতে পারছে, কোনো অমোঘ অভিশাপের কালো ছায়া নেমে আসছে একটু একটু ক'রে, তার দিকে এগিয়ে আসছে ! ভয়ে তার মুখ শুকিয়ে আসে। আর একটু হ'লে বুঝি জগদীশের আর রক্ষা থাকবে না, এমনই আর্তস্বরে সে বললে বুঝেছি আর ব'ল না !

গাছে গাছে ভোরের হাওয়ার শিহরণ। পাতায় পাতায় জাগরণের সাড়া শুরু হ'ল। একটি দুটি ক'রে পাখী জড়তার ডানা ঝটাপটি দিয়ে, ডেকে ওঠে।

তরুবালা কথা কইছে না। ওর দু-চোখে শ্রান্তির আলস্য।

জগদীশ স্তব্ধ। এমন এক দুর্বোধ্য স্ত্রীলোক তার সম্মুখে—সে যে কি করবে তা জগদীশ নিজে বুঝে উঠতে পারে না।

শিশিরে ভেজা ঘাসের শয্যা যেন আরামের নরম গালিচা। তরুবালা স্বচ্ছন্দে শুয়ে পড়েছে। আকাশে অসংখ্য তারার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে ওর ইচ্ছে হয়—ওখানে চলে যেতে। ওখানে হয়তো এতো মালিন্য নেই, হয়তো ওখানে শাসন বাঁধনের সাঁড়াশী দিয়ে জীবনের নির্বাধ মুক্তিকে রুদ্ধ করে রাখে না কেউ। ওই অজ্ঞাত রহস্যলোকের দিকে সশ্রদ্ধ তৃষ্ণার্ত দৃষ্টি মেলে থাকতে থাকতে তরুবালা কখন ঘুমিয়ে পড়েছিল। ঘুমিয়ে পড়েছিল জগদীশ। তবে তার চিন্তার প্রবাহ অন্য খাতে বয়। সেখানে শান্তির তৃষ্ণা নেই। আছে অর্থের লিপ্সা! মুক্তির প্রশ্ন সেখানে বড় নয়, আইনকে ফাঁকি দেওয়ার প্রশ্নই সেখানে মুখ্য। তবু আশ্চর্য এই যে, কাছাকাছি দুটি পুরুষ এবং রমণী একই নিদ্রার কোলে নিশ্চিন্তভাবে আত্ম-সমর্পণ করে।

যখন ওদের ঘুম ভাঙলো তখন বেশ বেলা হয়েছে। ঘুম ঠিক ভাঙেনি—বাগানের মালীর আহ্বানে গৃহস্বামী এসে কলরব তুলেছেন—কি কাণ্ড! এ আবার কারা? কোথা থেকে এলো, এঁ্যা!

প্রথমে জগদীশের ঘুম ভাঙলো, গৃহস্বামীর কণ্ঠস্বরে।

চোখ মেলে প্রৌঢ়কে দেখে সে প্রথমটা হকচকিয়ে উঠল। ইচ্ছে

করছিল আবার দু-চোখ বুজে মট্‌কা মেরে পড়ে থাকতে। তাকে জাগতে দেখে গৃহস্বামী বললেন—কে বাছা তোমরা?

তরুবালা তাকিয়ে দেখল, একবার জগদীশের বিব্রত মুখের পানে চাইল তারপর গায়ের কাপড় সামলাতে সামলাতে শুনলো, জগদীশ বললে—আমরা? ও, এই আমরা দু-জন।

গৃহস্বামী সহানুভূতির স্বরে বললেন—আহা, সারাটা রাত এই হিমের মধ্যে পড়ে রইলে। সঙ্গে মেয়েছেলে রয়েছে। তা একবার ডাকলেই পারতে, ওই বৈঠকখানাটা ছেড়ে দিতুম, স্বচ্ছন্দে বিছানাতে দুজনে ঘুমোতে।

সব কথাই তরুবালা শুন্‌ছে। শেষের কথাটা কানে যেতেই আপনা আপনি ওর মাথাটা নত হয়ে গেল।

তরুবালার সলজ্জ মূর্তির দিকে তাকিয়ে গৃহস্বামী বলেন—তা যাবে কোথায়?

জগদীশ মনে মনে তরুবালার ওপর খুব চটে যায়। কিন্তু গৃহস্বামীর সামনে বেমক্কা কিছু বলা চলবে না। এ এক ভীষণ সংকট। যেমন ক'রেই হোক এখন এই বুড়োর চোখে ধুলো দিতেই হবে। সে হাই তুলে তুড়ি দিয়ে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললে—যাবো আর কোথায়! তাঁর যেখানে ইচ্ছে সেখানেই টেনে নিয়ে যাবেন। তীর্থ আর কি।

গৃহস্বামী বিস্মিত হয়ে তাকালেন জগদীশের মুখের পানে। এই তরুণকান্তি যুবক বলে কি! তাঁর মুখে ফুটে ওঠে বিস্ময়ের অভিব্যক্তি—তীর্থ! এই বয়েসে!

তরুবালা মুখ নীচু ক'রে হাসি সামলায়।

জগদীশ উদাস স্বরে উত্তর দেয়—আর বলেন কেন, এর কি বয়েস বলে কিছু আছে? অসার সংসার মায়া মোহ বন্ধন থেকে মুক্তি হলেই মোক্ষ। তা সে বয়েস যাই হোক, মোক্ষই ত আসল। নাকি?

গৃহস্বামী সকালের ঝলমলে রোদের দিকে তাকিয়ে থাকেন। ঔদাস্যের ছোঁয়া যেন তাঁর মনেও লেগেছে। বেশ প্রফুল্ল কণ্ঠে বলেন —বাঃ, বাঃ! তোমরা একালের ছেলেমেয়ে···কিন্তু কী ধার্মিক! ছাখো বাবা, কখন কোথায় যে কি মেলে তা কেউ বল্‌তে পারে না। এই ধরো না, আমার ত চুল পেকেছে, বয়েসটা কম হ'ল না,—কিন্তু যথার্থ সৎসঙ্গ বল্‌তে আজই পেলুম। আহা, সাধু, সাধু! বউটি তোমার বড় লক্ষ্মী দেখছি।

জগদীশ এ ধরণের মন্তব্যের জন্যে তৈরীই ছিল। সে অম্লান-বদনে বললে—বউ! - বলবেন না, বলবেন না! এ সংসারে কেউ কারো আপন নয়, কেউ পরও নয়। আমার-আমার বলি—কিন্তু সত্যিই কি আমার আপন বল্‌তে কিছু থাকতে পারে?

গৃহস্বামী গদগদস্বরে বলে ওঠেন—ওঃ, সত্যি! আহা, মধু মধু। মধুবাতা ঋতায়তে! মধুক্ষরন্তি সিন্ধবঃ। সেই পরমেশ্বরই হ'ল সব। তুমি বাবা সার কথাটি বলেছ। ত্বয়া হৃষিকেশ হৃদি স্থিতেন। কিন্তু কে বাবা তা মনে রাখে! ভোরবেলা আজ নির্মল আনন্দ দিয়ে গেলে বাবা তোমরা!

জগদীশ মৃদু হাসলো—সবই তাঁর কৃপা। উপলক্ষ—আমরা হচ্ছি যন্ত্র, তিনি যন্ত্রী!

বল্‌তে বল্‌তে তরুবালার দিকে তাকিয়ে জগদীশ উঠে দাঁড়ালো। তরুবালাও যেন এর জন্যই প্রতীক্ষা করছিল।

উঠে দাঁড়িয়ে, আবার হেঁট হয়ে তরুবালা গৃহস্বামীর পদধুলি নিতে উদ্যত হ'য়ে বললে—পেন্নাম হই, বাবা!

গৃহস্বামী ব্যস্তভাবে সরে দাঁড়ালেন—আমি যে শূদ্র মা!

তরুবালা হাসলো—তাই কি হয় বাবা! জীব শিব—যত জীব তত শিব!

ওরা আর সেখানে একদণ্ডও দাঁড়ালো না। পথে নেমে জগদীশ হন্ হন্ ক'রে চল্‌তে লাগলো।

গৃহস্বামী সপ্রশংস দৃষ্টিতে ওদের দিকে তাকিয়ে থাকেন, বিড়-বিড় ক'রে নিজের মনে বলেন—ওঃ, আহা! এই হ'ল আদর্শ দম্পতি! আর ওই যে যিনি অন্দরমহলে মাংসের ড্যালাকে সোনা দিয়ে মুড়ে কেবলই নাকনাড়া দ্যান তিনিও স্ত্রী! কপাল, কপাল! আহা, অমন লক্ষ্মীপ্রতিমার মতো লক্ষ্মী না থাকলে জীবনটাই মিথ্যে। আহা, নারায়ণ, নারায়ণ!

॥ আট ॥

দিনের আলোয় তরুবালার চোখে মুখে আত্মপ্রত্যয়ের বলিষ্ঠতা সু-পরিস্ফুট।

জগদীশও নিজের সংকল্প ঠিক করে ফেলেছে।

তরুবালার দিকে তাকিয়ে সে বললে—আর নয়, অনেক কচলেছ! এবার ক্ষ্যামা দাও। তুমি তোমার পথ ছাখো, আমি কাজে যাই।

তরুবালা পরিহাসের হাল্কা সুর ফিরে পেয়েছে—ছুটি নেবে! আহা ঠাট্টা হচ্ছে, একবার তোমার ফাঁদে যখন পা পড়ে গিয়েছে তখন কি আমাকে না বেচে ছাড়বে!

জগদীশ রসিকতার মধ্যে মোটেই স্বাচ্ছন্দ্য খুঁজে পাচ্ছে না। কাল থেকে তরুবালা তাকে কেবলই জ্বালিয়েছে। তাই জবাব দিল —ঠাট্টা তুমিই করছ। বেশ ভালো ক'রেই জানো যে তোমাকে ঠিক হাঁস-মুরগীর মত বেচা যাবে না।

তরুবালার মুখে মুখে প্রত্যুত্তর—বেশ ত, তাহলে ক্রীতদাসীর মতোই নয় বিক্রি করো। সবই তোমার জানা রয়েছে, তবে আর ভাবনা কি!

জগদীশ উত্যক্ত বোধ করে—মেয়েমানুষ কথা কইতে শিখলেই যতো বিপদ বাধে।

তরুবালা চোখ নাচিয়ে বলে—কেন ?

জগদীশ বিষণ্ণভাবে এদিক ওদিক তাকায়। নিজের কপালে টোকা দিয়ে বলে—আর কেন! লোভে পড়ে ধরে রয়েছি কিন্তু কাজে এক কড়াও কায়দা হচ্ছে না। সেরেফ কথার বুজকুড়ি কেটে বেড়াচ্ছ!

তরুবালা উৎসুক নেত্রে জগদীশের দিকে আড়চোখে চেয়ে একটু হাসল—লোভ? কিসের লোভ!

—এ্যাই ভ্যাখো, জেনে শুনে ন্যাকা সেজে আমাকে বোকা বানাতে চাও—অবিশ্যি এটাই মেয়েমানুষের স্বভাব।

তরুবালা আশান্বিতভাবে কান পেতে থাকে।

জগদীশ নির্বিকারভাবে বলে চলে—টাকার! বুঝলে, পুরুষমানুষের জীবনে যেটি সবচেয়ে বেশি দরকার।

দীর্ঘশ্বাসটুকু বুকের মধ্যে হজম করে ফেল্‌ল তরুবালা। পথ চল্‌তি লোকের ভিড় ক্রমশঃ বাড়ছে। সেদিকে নিশ্চিন্তভাবে দৃষ্টি রেখে তরুবালা প্রশ্ন করে—আচ্ছা পুরুষমানুষের জীবনে আর কোনো কিছুরই দরকার নেই বুঝি?

—আবার কথার খেলা শুরু করলে? বাজে সময় নষ্ট। মুখের কথায় টাকা জন্মায় না। বুঝেছি, বল্‌ছি ত, তোমাকে দিয়ে আমার কানাকড়িটিও ট্যাঁকে আসবে না।

গত রাতের খিদেটা এখন যেন তরুবালার সারা অঙ্গে এক অবশ শৈথিল্য এনে দিয়েছে। কিন্তু জগদীশের কাছে মুখ ফুটে বলতে সঙ্কোচ বোধহয়। তার চেয়ে এ বেশ চল্‌ছে—কথার নেশায় নিজেকে যত-

ক্ষণ ভুলিয়ে রাখতে পারা যায় ততক্ষণই কষ্টবোধটুকুর হাত থেকে নিষ্কৃতি মেলে। ও বললে—বেশ, চলো—কোথায় আমায় নিয়ে যেতে চাও! তোমায় কথা দিচ্ছি কেনা বেচার সময় আমি এমনি ক'রে ঘোমটা দিয়ে থাকবো—

ব'লেই তরুবালা শাড়ীর আঁচল তুলে ঘোমটা টেনে ফিক্-ফিক্ ক'রে হাস্তে লাগলো। জগদীশ তাকিয়ে দেখলো, আর মাথাটা ডান দিকে ঝুঁকিয়ে বললে—আরে, ঘোমটা দিলে তোমায় মন্দ দেখায় না ত!

তরুবালা ঘোমটা নামালো না। সহজভাবেই বললে—কেন মন্দ লাগে না, বল তো?

চিন্তিতভাবে জগদীশ চুপ ক'রে পথ চলে। চৌমাথার মোড় পেরিয়ে ওরা একটু জনবিরল পথ ধরেছে। ধুলো উড়িয়ে খান দুই গরুর গাড়ি কাঁচা পথ দিয়ে ছুটে চলেছে। উল্টো দিক থেকে একখানা সাইকেল আসছে। পথের পাশে একটা খেজুর গাছে বাবুই-এর ঝুলন্ত বাসার দিকে তাকিয়ে জগদীশ জবাব দিল—তোমার স্বভাব-চরিত্র যদি ভালো হত তাহলে বড় ঘরের বৌ হতে পারতে অনায়াসে। তরুবালা এ জবাবে একটু মজা পায়, পাল্টা প্রশ্ন করে- তুমি বুঝি চরিত্রের কষ্টিপাথর সঙ্গে নিয়ে ঘোরো?

—কেন?

—নইলে কি করে বুঝলে আমার স্বভাব মন্দ?

—আরে! মন্দ মেয়েমানুষ ব'লেই ত আমার সঙ্গে ভাব আলাপ হ'ল। নইলে রেলগাড়িতে উঠে অবধি আমার দিকে মুকিয়ে বসে রইলে!

তরুবালা এতক্ষণ অবধি হাস্যপরিহাসের মধ্যে নির্মল আনন্দ-স্বাদ গ্রহণ করছিল। কিন্তু রেলগাড়ির কথা উঠ্‌তেই একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়ল। বিকেলের পড়ন্ত রোদের মায়ামাখানো আলোতে যে সুন্দর যুবকের আত্মভোলা মুখ দেখে মুগ্ধ হয়েছিল তরুবালা—সে কি এই জগদীশ, না অন্য আর কেউ? কাল বিকেলের সে ছবিটি যেন অলৌকিক এক আনন্দস্বরূপ। তরুবালার অভিমানক্ষুব্ধ অন্তরের সমস্ত জ্বালা ওই মুখখানার দিকে দৃষ্টি পড়্‌বামাত্র নির্বাপিত হয়ে গিয়েছিল।...তাই যখন জগদীশ ট্রেনের কথা তুল্‌ল তখন তরুবালার মনে ভাবান্তর ঘটে গেল। এই লোকটার যদি বিন্দুমাত্র স্নেহমমতা থাকতো তাহলে এভাবে ওই ঘটনাকে বিকৃত ক'রে দেখিয়ে ব্লা দেখে আমোদ পেত না॥ ব্যথিত হয়েই আস্তে আস্তে তরুবালা বললে—বুঝলুম, জীবনে তুমি ভালো কিছু দেখো নি। তাই তোমার চোখে সবকিছুই মন্দ।

জগদীশ বিরক্তকণ্ঠে জবাব দিল,—তত্ত্বকথা অনেক শুনেছি। ও আর আমায় শিখোতে এসোনা। মেয়ে না মাটির ভাঁড়। বারো হাত কাপড়েও—

তরুবালা বাধা দিল—আঃ কি সব যা তা কথা বল্‌ছ। থামো—

—আমি? আমি কথাই বল্‌তে চাই নে। তুমিই ত কাল থেকে কলের গানের মতো বেজে চলেছ।

—অতো রাগ করছ কেন, আমি ত তোমাকে বলেই দিয়েছি ক্রীতদাসীর মত বেচে দাও, বলেছি ছুরি মেরে শেষ ক'রে দাও। যা খুশি তাই করো।

—মুখের কথা!

—আমার মুখের কথাই সব। যা করলে তুমি সুখী হও মানে টাকা পাও তাই করো।

জগদীশ জিজ্ঞাসা করল—নিজের ইচ্ছেয় একথা দিচ্ছ তুমি! জোর ক'রে তোমাকে দিয়ে কথা আদায় করছি না, মনে থাকে যেন। পরে আবার কেঁইচেপনা ক'র না।

তরুবালা বললে—নিশ্চয়! আমি এক কথার মানুষ।

হাসলো জগদীশ। সামনেই বাজারের বসতি শুরু হয়েছে। এখানে ওখানে কর্মব্যস্ত লোকজন। মালবাহী গাড়িগুলো গরু খুলে দিয়ে রাস্তার পাশে গাছের নীচে অপেক্ষা করছে। একটি আট-ন বছরের ফুট্‌ফুটে মেয়ে ছোট্ট শাড়ী পরে মুখে আঙুল-গুঁজে ফ্যাল্-ফ্যাল্ ক'রে দেখছে তরুবালাকে। সেদিকে চোখ পড়তেই তরুবালা একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে। ওর ছোটবোনও এই বয়সীই হবে, তার চোখের চাহনীর সঙ্গে এই বালিকার দৃষ্টির কোথায় যেন সাদৃশ্য রয়েছে। নিজের বাড়ি, বাবা-মা, ভাইবোন, দাসীচাকর সকলের মুখ যে এইভাবে মনের মুকুরে ভিড় ক'রে আসবে তা কি তরুবালা কখনো ভেবেছিল? না, তারা যতই উত্যক্ত করুক, তরুবালা আর ফিরবে না। সোনার শিকল একবার যখন কেটে বেরিয়ে আসতে পেরেছে তখন আর ওই খাঁচার মধ্যে গিয়ে সুখে থাকা তরুবালাকে দিয়ে কিছুতেই হবে না। সুখ? পদে পদে নিষেধ আর নির্দেশের বিনিময়ে একটু শারীরিক স্বাচ্ছন্দ্য পাওয়ার নাম যদি সুখ হয় তবে সে সুখে তরুবালার রুচি নেই। তার চেয়ে গাছপালায় ছাওয়া পল্লীর পথে পাখীর গান শুনে খিদের তাড়নায় ঘুরে বেড়ানো অনেক বেশি সুখের। তা নয় ত কি। নিজের খুশিতে ইচ্ছেমত চলা,

নিজেকে আপন রুচিমত খরচ করা কিম্বা না করা—সবকিছুই আপন অধিকারের সীমায় রয়েছে। এর চেয়ে বড় সুখ কিছু কি আছে।

জগদীশ এসব বোঝেনা, তার মনে টাকার স্বপ্ন। সে বললে—এই ত বাজারের ধার। তুমি একখানা ঘর ভাড়া নিতে পারো এখানে। এমন চেহারা থাকলে, টাকাকড়ি সোনাদানা তোমার পায়ের ওপর লুটোপুটি খাবে। ভাবনা কি! আর যেমন-তেমন কপাল খুলে যায় ত সিনেমা কোম্পানীর দালালরা গাড়ি হাঁকিয়ে তোমার দোরে ধন্না দিতে আসবে।

তরুবালা সংক্ষেপে প্রশ্ন করে—তারপর?

জগদীশ খুশির আনন্দে উচ্ছ্বসিত—তারপর, ধরো দশ-বিশটা ভদ্রলোকের সঙ্গে ভাব-আলাপ।

—তারপর?

—তারপর। তোমার ঘর হবে কুবেরের ধনভাণ্ডার। একেবারে অফুরন্ত ঐশ্বর্য। আমাদের মতন পাঁচটা লোকের কপালও ফিরে যাবে।

তরুবালা তবুও ক্ষান্ত হয় না, আবার বলে—তার পরেরটা বলো, সব শেষের কথা বলো। তারপর ঘর ভাড়া নিচ্ছি।

জগদীশ বল্লে তাচ্ছিল্যভরে—অত পর পর করছ কেন, তোমার ত কাজই হ'ল পরকে আপন করা। আর হাতে-হাতে নগদ বিদায় পেয়ে যাচ্ছ। এর পরও ভবিষ্যৎ ভাবার কি আছে। তুমি টাকা সামলাবে, ভবিষ্যৎ নিজেকে নিয়ে পড়ে মরুক না।

তরুবালা গম্ভীর ভাবে জবাব দিল—তোমার ওই কুবেরের ধনভাণ্ডারেও যদি আমার মনের খিদে না মেটে? তখন তুমি আমাকে কি দিয়ে শান্ত করবে, তৃপ্তি দেবে?

জগদীশ অস্বস্তি বোধ করে, অসন্তোষ তার চোখেমুখে ফুটে ওঠে। সে ডান পা দিয়ে একটা শক্ত মাটির ড্যালা চাপ দিয়ে ভাঙতে ভাঙতে বলে—তোমার এই দর্শনতত্ত্ব আওড়ানোর মানেটা কি ?

এ কথায় তরুবালা আবার হেসে উঠল।

জগদীশ এ হাসিতে ততোধিক বিপন্ন হয়ে ওঠে—তোমার প্যাঁচে আমাকে ফেলে নিংড়ে নিতে চাও, বুঝেছি! এরই নাম অসৎসঙ্গ।

জগদীশের দিকে তাকিয়ে তরুবালা আর একদফা হাসলো। আবার সেই ছোট্ট মেয়েটির দিকে চোখ পড়ল। বালিকাটি টের পেয়েছে তরুবালা তাকে দেখছে। ফিক্ ক'রে হেসে মেয়েটি মুখ ঘুরিয়ে নিল।

ওদিকে জগদীশ রাগতভাবে বলে—তুমি কি আমাকে নিয়ে এবার পুতুলনাচ নাচাবে ?

জগদীশের উষ্মাতে তরুবালা বিচলিত নয়, তার চোখে চোখ পড়তে তরুবালা বললে—আচ্ছা বলতো, কেবলই আমাকে অন্যের কাছে বিক্রি বা ভাড়া খাটাবার কথা ভাবছো কেন! তার চেয়ে তুমিই আমাকে কিনে ফ্যালো না।

—তোমাকে কিনবো, তারপর রাখবো কোথায় ?

তরুবালা বলে—মাথায় রাখতেও বলিনে, আবার পায়ের তলাতেও নয়! ধরো তোমারই কোনো আস্তাকুড়ে—

জগদীশ জবাব দিল—তোমার উপযুক্ত দাম দেবো কোত্থেকে ?

তরুবালা পিছন ফিরে সেই বালিকাটিকে আবার দেখে নিল, বললে—আমার উপযুক্ত দাম? মানে, টাকার কথা বলছ। সে না হয় আমি তোমায় ধার দেবো।

এবার জগদীশ হেসে ফেল্‌ল—তোমার কাছে ধার করা টাকা নিয়ে, তোমাকে কিনব ? বাঃ, বেশ কথা।

—মন্দ কি ! হাতে তোমার টাকাও পড়বে, আবার উপরি আমি হবো ক্রীতদাসী।

চিন্তিত হয়ে পড়ে জগদীশ। বলে—তারপর ?

—তারপর পাঁচটা পুরুষ মানুষ এসে তোমার ঘরে ক্রীতদাসীকে নিয়ে আমোদ তামাসা করবে। সেই তোমার আনন্দ।

জগদীশ গম্ভীরভাবে বলে—হুঁ ! শুনেছি বটে আজকাল ভদ্রঘরে এ রকম করে। কিন্তু তারা ত স্ত্রী !

তরুবালা সকৌতুকে বলে—বাঃ ! এই ত বেশ বুঝে ফেলেছ ! তাতে ক'তো সুবিধে হয় বলো দেখি, অথচ নিন্দেও নেই'।

জগদীশ বিভ্রান্ত দৃষ্টিতে তাকায়—মানে ? কি বলছ ?

তরুবালা বেশ বিজ্ঞভাবে বাঁ হাতের তালুতে ডানহাতের তর্জনী ঠুকে বলে - আরে, বুঝলে না ? নিন্দে রটাবার আগে বিয়ে করে, কিন্তু বিয়ের পর থেকে আর নিন্দের কথা ওঠে না !

জগদীশ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকালো তরুবালার চোখের পানে—তুমি এত সব জানলে কোত্থেকে ? নিশ্চয় তুমি ওদের দলের !

তরুবালা নিজেকে সামলে নিল। এত সহজে ধরা পড়তেও নারাজ। তাই হাসির হাল্কা পর্দা ফেলে দিল নিজের মুখের উপর, বললে—এক রাত্রির অসৎ সংসর্গে বহুকালের শিক্ষা মিলে যায় !

জগদীশ এবার লজ্জা পেল। সেই সঙ্গে জবাবও খুঁজে পেল না আর। সে হাসি মুখে মাথা চুলকোতে চুলকোতে বললে—সব

তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে। চলো কিছু খাওয়া যাক। বড্ড খিদে পেয়েছে, পেট জ্বলছে। তোমারও ত সেই অবস্থা।

তরুবালা বাঁকা হাসি হাসলো—রোজগারের মতলবে থাকলে কি আর খিদে তেষ্টার কথা মনে থাকে ?

—আর লজ্জা দিয়ো না।

—অবাক করলে—তোমার লজ্জা ?

—দ্যাখো তোমাদের শাস্ত্রে আছে পরাস্ত শত্রু যদি আত্মসমর্পণ করে ত তাকে আর আক্রমণ করা অধর্ম !

এবার তরুবালা হেসে ফেললে, বললে—না, আর কামড় দেবো না। অন্য সময় হ'লে তোমার এ কথার উত্তরে বলা যেতে পারতো, চোরের মুখে ধর্মের কথা মানায় না। তা সে এখন থাক। চলো, তোমার যখন খিদে পেয়েছে তখন এই সামনের দোকানেই—

—এঃ, এটা আবার চেনা দোকান !

—তা হোক, দিনের বেলা চেনা-অচেনা নিয়ে মাথা ঘামিয়ে কি হবে।

॥ নয় ॥

রাঙাদির দুশ্চিন্তায় রাত্রিও শেষ হয়ে গেল। রাত্রি শেষ হ'ল কিন্তু দুর্ভাবনা রয়ে গেল। আর রইলো সঙ্গী গোপাল বিগ্রহ। তা ছাড়া রাঙাদির আর কিছু রইল না। সকালে আলো ফুটতেই বৃদ্ধা বললেন—চলো দিদি, বাবা কালভৈরবের সঙ্গে দেখাটা ক'রে আসি!

রাঙাদি বললেন—তুমি যাও দিদি, আমি মেয়েটাকে খুঁজে দেখি।

বৃদ্ধার মুখে হাসির রেখা। বলেন—হারিয়ে গেলে খুঁজে মেলে। কিন্তু ও তো তোমার হারায় নি, পালিয়ে রয়েছে ভাই। লুকিয়ে লুকিয়ে একটু রং-তামাসা করছে।

রাঙাদি গোপালকে বুকে আঁকড়ে ধরেন—কি যা তা বল্‌ছ দিদি, তরু আমাদের তেমন মেয়ে নয়।

—আমি ভাই ঠিকই বলি, মেয়ের আবার এমন তেমন কি! আম হ'লেই বোঁটা থাকে ভাই, আঁটিও থাকে—তেমনি আর কি।

রাঙাদির মুখখানা ক্রোধে রক্তবর্ণ হয়ে ওঠে। তিনি শুধু বললেন—গোপাল! গোপাল!

—হাঁ, গোপাল যা করেন তাই হবে। তা গোপাল আমাদের রসিক নাগর।

—তাঁর লীলাতেই চন্দ্রসূর্য উঠছে, তা এখন তাঁর ইচ্ছে।

বৃদ্ধা বক্র হাসি হেসে বলেন—লীলাময়ের লীলা বোঝা ভার! তোমার ওই নাতনীকে নিয়ে তিনি হয়তো রাসলীলা করছেন একটু!

এবার রাঙাদি তেলেবেগুনে জ্বলে ওঠেন—আ মর মাগী! তিনকাল গিয়ে এককালে ঠেকেছে, পরপারে পা বাড়িয়েছিস—এখনো তোর মনের ময়লা ঘুচলো না!

বৃদ্ধা এবার প্রশান্ত হাসি হেসে বলেন—আহা, রাগ করলে দিদি! দুটো রসের কথা, তা প্রাণের মানুষ দেখলে কইতে ইচ্ছে করে, তাই বলা।

রাঙাদির রাগ এখনও কমেনি, বলেন—তাবলে ঠাকুর দেবতা নিয়ে এসব কি কথা! গোপাল! গোপাল!

বৃদ্ধা হাসলেন—আরে গোপাল কি আমার পর নাকি! ঠাকুর-দেবতা ছাড়া এখন আর আপন ব'লে কেউ ত নেই দিদি, তাই তাদের নিয়েই থাকা। তা যদি ভালো মন্দ বল্‌তেই হয় তাদের নিয়েই বলা।

রাঙাদি বুঝতে পারেন না এই বৃদ্ধাকে। এরকম হেঁয়ালি কথা-বার্তা তিনি কখনো শোনেন নি। তাই ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকেন বৃদ্ধার মুখের পানে। বৃদ্ধা তাঁর স্বভাবসিদ্ধ হাসি ছড়িয়ে বলেন—যাই বলো দিদি, তোমার মনে এখনো সংসারের পিছুটান রয়ে গিয়েছে।

—গোপাল, গোপাল!

—মুখে গোপাল বুলি, বুকে গোপাল ঝুড়ি, কিন্তু মনে যে তোমার এখনো বাসনার বিষ রয়েছে ভাই।

রাঙাদি বললেন—তুমি কোন্ গণকঠাকরুণ গা! কেবল শাপমান্যি করো?

—এ্যাই ছাখো! তা ভাই রাগই করো আর গালই দাও—হক কথা আমি বলে যাই।

—তুমি আমার কোন্ গুরুঠাকরুণ গা, কুটুস কুটুস বলবে আর তাই আমাকে শুনতে হবে! যাই আমার কাজ আছে।

বৃদ্ধা বললেন—কাজ, আর কাজ! আরে বাপু কার কাজ কে করে? তোমার অতো মাথাব্যথা কিসের। মেয়ে বড় হয়েছে পা গজিয়েছে—ব্যস্ এবার তার বিবেচনা বুদ্ধির ওপর ছেড়ে দাও। গিয়েছে, যাক না! ফেরবার হয় ফিরবে। আরে মাথার ওপর তিনি রয়েছেন, তিনিই দেখবেন। অতো দারোয়ান পেয়াদার মতো আগলে বেড়াও কেন?

রাঙাদি গম্ভীরভাবে বলেন—তোমার ওসব বড় বড় কথা বসে বসে শুনলে আমার চলবে না। মা-বাপের মেয়ে, সঙ্গে করে এনিছি, দায়িত্ব বলে একটা কথা আছে ত!

বৃদ্ধা বললেন—সেই কথাই বলছি দিদি, দায়িত্ব যদি তোমার নিজের কাঁধ থেকে নামাতে না পারো তো ঠাকুরের নাম নাও কেন মুখে। হয় সংসার করবে ত চুটিয়ে করো, আর না হলে একেবারে গোপালের পায়ে নিজেকে সঁপে দাও! তা ত নয়, দুদুও খাবে তামাকও খাবে! আরে তা করলে কি তাঁর কৃপা হয়!

রাঙাদি মুখ বাঁকিয়ে মনে মনে বলেন—মাগীর চ্যাটাং চ্যাটাং কথা শুনলে আমার গা জ্বলে যায়! আমি মরছি নিজের জ্বালায়। প্রকাশ্যে তিনি বলেন—গোপাল, গোপাল! তাঁর কৃপায় তোমার

স্বর্গের সিঁড়ি তৈরী হোক দিদি। আমি নয় নরকেই যাবো। তা বলে স্বর্গের লোভে অমন সোনার প্রতিমাকে ভাসিয়ে দিতে পারবো না।

বৃদ্ধা বললেন—সে আর বুঝতে বাকী নেই। যাও এখন, পেয়াদার মতো টহল দিয়ে বেড়াও। তা একটা কথা বলি দিদি—

রাঙাদি চলে যাচ্ছিলেন, আবার দাঁড়াতে হ'ল—কি কথা?

—ওই গোপালকে কেন মিছে কষ্ট দাও! ওর পূজো-ভোগ এসবের কি হবে?

—দেখি কি হয়।

—দ্যাখো। যদি কালভৈরবের থানে যাও আবার দেখা হবে।

—গোপাল, গোপাল!

মনে মনে রাঙাদি বৃদ্ধার প্রতি বিরূপ হয়ে উঠেছেন। তাই আর কথা দিয়ে কথা বাড়াতে ইচ্ছে করে না।

বেলা বেড়ে যায়। রোদ তেতে ওঠে। রাঙাদি একলাই একখানা টাঙা ভাড়া নিয়ে কালভৈরবের মন্দিরে রওনা হ'লেন। শহরের আনাচে-কানাচে, এখানে ওখানে অনেক খুঁজলেন কিন্তু তরুবালাকে দেখতে পেলেন না। মুখ ফুটে কারুর কাছে জিজ্ঞাসা করতে পারেন না, পাছে কথাটা মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়ে। কথার গতি হাওয়ার চেয়েও দ্রুত—একথা রাঙাদির জানতে বাকী নেই। তাই মুখ বুজে, সতর্ক দৃষ্টি রেখে এখানে ওখানে ঘুরে ঘুরে দেখলেন। না, কোথাও পাত্তা নেই। তবে কি তরুবালা বাড়ি ফিরে গেল? নাকি মামার বাড়িতেই গিয়ে উঠেছে? সবরকমই ভাবলেন তিনি।

কিন্তু সাহস হয় না কুলকাঠি গিয়ে তরুবালার মামার বাড়িতে খোঁজ নিতে। যদি সেখানে তরুবালা না গিয়ে থাকে, তাহলে তাঁরা কৈফিয়ৎ চাইবেন! কি জবাব দেবেন রাঙাদি? বল্‌বেন কি, যে, তরু হারিয়ে গেছে! তারপর? ঢি-ঢিক্কার পড়ে যাবে। লোক জানাজানি হতে তিন মিনিটও লাগবে না। সে কথা ভাবতেও ভয় করে। না, তার চেয়ে কুলকাঠিতে গিয়ে কাজ নেই। আর সত্যি কথা নিজের কাছে রাঙাদির বল্‌তে বাধা নেই। ও মেয়ের চোখ-মুখের চেহারাই তেমন নয়। ভাবগতিক মন্দ! ও মেয়ের চোখ ফুটেছে, মুখেচোখে কথা কয়।...হুট্‌ ক'রে হারিয়ে যাবে?

খুঁজে-খুঁজে হাল ছেড়ে দিয়ে রাঙাদি ক্লান্ত হয়ে কালভৈরব মন্দিরে হাজির হলেন। যাত্রীর হুড়োহুড়ি, ভিখারির 'দেহি-দেহি,' ফেরি-ওয়ালার হাঁক-ডাক, পাণ্ডাদের খবরদারি—এ এক মহাসমারোহ কাণ্ড! ঢাক-ঢোল, সোরগোল—মন্দিরের চারপাশ গম্‌গম্‌ করছে।

ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে রাঙাদি একটু ফাঁকা জায়গা দেখে বসলেন।

যাত্রীদের থাকাখাওয়ার বন্দোবস্ত মোটামুটি সবই রয়েছে। তীর্থের এই একটা সুবিধে, পয়সা ফেল্‌লে অভাব হয় না কিছুরই।

স্নান সেরে, পূজার্চনা ক'রে রাঙাদি মন্দিরে দেবদর্শন করলেন। কিন্তু সেখানে ঠাকুরের পায়ে মাথা রেখে রাঙাদি একান্ত কাতরভাবে প্রার্থনা করলেন—ঠাকুর, আর কোনো বাসনা আমার নেই। দয়া ক'রে তরুবালাকে ফিরিয়ে এনে দাও! তোমায় আমি সোনার বালা গড়িয়ে দেবো। ফিরিয়ে এনে দাও ঠাকুর, নইলে আমি যে আর বরানগরে ফিরে গিয়ে মুখ দেখাতে পারবো না। আমার খাতকদের কাছে আর টাকার তাগাদা করতে পারবো না। নিঃসম্বল

বিধবার তিন হাজার টাকা পাঁচভূতে লুটে খাবে যে। তরুবালাকে ফিরিয়ে আনো, ছাখো তোমায় সোনার বালা গড়িয়ে দিই কি না।

রাঙাদির বিশ্বাস কালভৈরব জাগ্রত দেবতা। দেবতা যদি জাগ্রত হন, তাহলে তাঁর পার্থিব ধনদৌলতের প্রতি কিঞ্চিৎ আসক্তি থাকাটা খুবই স্বাভাবিক। এবং সেই জন্তই দেবতা তাঁর অলৌকিক ক্ষমতা প্রয়োগ ক'রে বাঞ্ছিতের বাঞ্ছা পূর্ণ করেন, প্রতিদানে প্রাপ্তি-যোগের লোভে।

আহারাদি সমাপ্ত ক'রে আঁচল বিছিয়ে রাঙাদি কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। ঘুম ভেঙে দেখলেন, সেই বৃদ্ধাটি তাঁর পাশে বসে।

রাঙাদিকে চোখ মেলতে দেখে বৃদ্ধা সহানুভূতির কণ্ঠে বললেন—আহা, ঘুমোও দিদি! কাল থেকে তোমার স্বস্তি নেই।

—আর ঘুম!

—অ, পাওনি বুঝি! মিছে ঘুরছো দিদি, তার ভাবনা সে ভাবুক।

—তা পারলে ত হতো দিদি! অবলা মেয়েটা—

—অবলা, আহা বোবা বুঝি।

রাঙাদি এবার সোজা হয়ে উঠে বসলেন—ষাট বালাই, বোবা কেন হবে? অমন সুশ্রী মেয়ে হাজারে একটা চোখে পড়ে। লেখায় পড়ায়, কথায় বার্তায় সবদিক দিয়ে সেরা মেয়ে।

বৃদ্ধা নিশ্চিন্তভাবে বললেন—অ, কলেজে পড়ে? সিনেমা ছাখে?

রাঙাদি জবাব দিলেন—অতশত জানিনে দিদি। সবাই যা বলে তাই শুনি। আমি আছি আমার গোপালকে নিয়ে। সিনেমা-থ্যাটার যে দেখিনে তা নয়, ঠাকুর দেবতার পালা হ'লে দেখি। তবে আজকালকার মেয়ে যেমন হয় তেমনি মেয়ে আমাদের তরুবালা!

—তবে ত্থাখো দিদি, সে নিজের পথ করে নিয়েছে। ভালোই ত হ'ল বিয়ে থা দেবার জন্যে এক কাঁড়ি ট্যাকা খসবে না।

—আহা ঠাকুরের থানে এয়েছ দিদি এখন দুটো ভালো কথা ভাবো না।

ব'লে রাঙাদি উঠে দাঁড়ালেন—যাই দেখি, এখানে এসে ছুঁড়ি আবার আমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে নাকি।

—তাই ত্থাখো। আহা, মা-বাপ কেউ নেই বুঝি ওর?

—আছে সবই। অভাব কিছুই নেই।

—তাই বলো, নইলে এত দুঃখু কেন হবে। বলে যার যতো সুখ তার ততো দুখ।

—গোপাল, গোপাল!

রাঙাদি যাত্রীদের ভিড়ের মধ্যে হারিয়ে গেলেন।

বৃদ্ধা আপন মনেই হাসতে হাসতে বলেন—ঠাকুর দোষ নিয়ো না। এইসব ভড়ং দেখলে আমার সহ্য হয় না। গোপালের বিগ্রহ বুকে নিয়ে মাগী কেবল বিষয় চিন্তা করছে, তাই দুটো কথা বলি।

রাঙাদি রাত্রে কালভৈরবের মন্দির সংলগ্ন যাত্রীশালাতে রইলেন। এখন কয়েক দিন তিনি এখানেই থাকবেন। যতদিন তরুবালার কোনো হদিস না পাওয়া যায় ততদিন এই অচেনা জায়গায় গা-ঢাকা দিয়ে থাকা ছাড়া উপায়ই বা কি আছে? এখানে রাত কাটিয়ে দিনের বেলা শহরে যাবেন। রাঙা ঠাকুরুণকে ফাঁকি দিয়ে আজ পর্যন্ত কেউ পার পায় নি। তরুবালা ত এই সেদিনের মেয়ে। মনে মনে একটু হেসে নিলেন রাঙাদি। ক'দিন গা-ঢাকা দিয়ে কাটাবে

ও। শহুরে মেয়ে, বাইরে না বেরিয়ে থাকতে পারবে কেন! পাঁচটা ছেলেছোকরার চোখে না পড়তে পারলে বেঁচে থাকাই যেন ওদের বৃথা–ভাত হজম হয়না। অতএব একদিন না একদিন তরুবালাকে রাঙাদির হাতে ধরা দিতেই হবে। তারপর তিনি টের পাইয়ে দেবেন তরুবালাকে—শিক্ষা কাকে বলে।

রাঙাদি নিজের মনে ভাবেন আর হাসেন। কল্পিত প্রতিশোধের ছবি দেখার আনন্দে রাঙাদির চোখের ঘুম পালায়।

॥ দশ ॥

হোটেলে ঢুকে তরুবালা চারিদিকে চোখ বুলিয়ে নিল। জায়গাটা বড় নোংরা। ঘরখানাও কেমন যেন ঝুপসি. ভালো করে আলো ঢোকে না। তবু ওর মুখেচোখে কোনো বিকৃতির চিহ্ন ফুটলো না। পৃথিবীর আসল চেহারাটা ওকে দেখতে হবে। নাক সিঁটকে দোতলায় বসে থাকলে দেখা যায় না, জানা যায় না পৃথিবীকে, পৃথিবীর মানুষকে। তার চেয়ে পথে নেমে ঘুরে ঘুরে মানুষকে দেখার মধ্যে বৈচিত্র্য আছে বইকি। ওই যে ওইখানে লোকটা খাচ্ছে—ওর চোখে মুখে কি তৃপ্তি! যেন জীবনের সমস্ত একাগ্রতা ওই সামান্য আহার্যকে কেন্দ্র ক'রে জমে উঠেছে।

জগদীশকে দেখে দোকানদার হাঁক দিল—কি রে জগা?

তরুবালার দিকে একটু আড়চোখে তাকিয়ে দোকানী কৌতূহল দমন করতে না পেরে বললে—এসব আবার কি, হ্যাঁ রে!

জগদীশ জবাব দিল—ক্রীতদাসী।

দোকানদার ফ্যাল ফ্যাল ক'রে চেয়ে রইল।

তরুবালা উচ্ছলভাবে জগদীশের কথার জের টেনে বলে—একটু ভুল হ'ল। দাসী কিনা জানিনে, তবে ধারে কেনা।

চাকর এসে খাবার দিয়ে গেল।

তরুবালা খেতে খেতে কোণের ওই একাগ্র লোকটির দিকে তাকায় আর ভাবে ওর নিজের চোখেমুখেও বুঝি অমনি তৃপ্তির ভাব ফুটে উঠেছে। হ্যাঁ, তা উঠতেই পারে, যা খিদে পেয়েছিল। সেই কাল রাতে একখানা তেলেভাজা কচুরী জগদীশের দয়ায় খেতে পেয়েছিল তরুবালা—তারপর আজ এই এতবেলা অবধি কিছুই জোটেনি। পরক্ষণে জগদীশের মুখের পানে চাইল তরুবালা, আহা, তরুবালার জন্য জগদীশকেও ত এই কষ্টটা ভোগ করতে হয়েছে। অথচ এমন মানুষ যে, বারেকের তরেও সে সব অসুবিধের কথা মুখে আনেনি। তরুবালা যে জগদীশকে দেখছে জগদীশ আদৌ সেটা টের পায় না।

পয়সা দেবার জন্যে জগদীশ পকেটে হাত দিতেই তরুবালা বটুয়া থেকে টাকা বার করে দোকানীকে দিল। বিস্মিত জগদীশ বললে—তুমি দিচ্ছ কেন?

তরুবালা হেসে জবাব দিল—নইলে অম্বলশূল হবে যে! তোমার পয়সা খেয়ে হজম হবে না তা কি বুঝিনি?

দোকানীর দিকে জগদীশ তাকিয়ে বললে—হরবোলা, ভাই! হরবোলার পাল্লায় পড়ে নাকাল হচ্ছি।

দোকানী ঈর্ষায় জ্বলে যাচ্ছে, তবু মুখে বলে—কপাল ভাই, কপাল। এমন জ্বালা ক'জনের ভাগ্যে জোটে।

ওরা দোকান থেকে বেরিয়ে পথে এসে পড়তেই তরুবালা বললে—এবার একটু কোথাও বসতে পারলে হ'ত। চলো ওই পুকুরধারে যাই—বেশ ছায়া পড়েছে গাছের। ঠাণ্ডাও বটে,

নিরিবিলিও বেশ। ওখানেই তোমার প্ল্যানটা বেশ ভালো করে বুঝিয়ে দেবে চলো। কেমন!

জগদীশ গম্ভীর হয়ে পড়েছে। সে চিন্তিতভাবে বলে—কাল রাত্তিরে তুমি যে রকম ছিলে আজ দিনের বেলা ঠিক সে-রকমটি নেই। নাকি আমারই মগজটা এলোমেলো হয়ে গেছে? শেষে কি তোমার খপ্পরে পড়ে আমাকে ঘুরপাক খেতে হবে? ব্যাপার ত বুঝতে পারছি নে।

তরুবালা হাসিমুখে গ্রীবা উঁচু ক'রে একবার জগদীশের দিকে তাকালো। কিছু জবাব দিলে না। সরাসরি ছায়াবিসারিত পুকুর পাড়ে গিয়ে বসে পড়ল তরুবালা। দুপুরেই বাঁশবনে হাওয়া বইছে সাঁই-সাঁই, শুক্‌নো পাতাগুলো উড়ছে—তার শব্দে নির্জন অঞ্চলে অপূর্ব মুখরতা। আকাশ দেখা যায় না। বাঁশঝাড়ের ফাঁক দিয়ে এখানে ওখানে রোদ এসে পড়েছে মাটিতে। আলোছায়া দিয়ে কে যেন ঝালর বুনে রেখেছে এই ঘুঘু-ডাকা দুপুরের বুকে।

মুগ্ধ বিস্ময়ে তরুবালা যেন স্তব্ধ হয়ে যায়। কান পেতে শোনে, দূর থেকে ভেসে আসা রাখালিয়া বাঁশির সুর। চকিতে চেয়ে ছাখে জগদীশের শান্ত, সমাহিত, সুকুমার মুখখানা। তরুবালার বিশ্বাস হয় না যেন, এমন সুন্দর যে মুখ তার মনের মধ্যে নীচতার, মালিন্যের কোনো কালো দাগ থাকতে পারে। তরুবালার বিশ্বাস, নিতান্ত সঙ্গদোষে পড়ে' এই সরল মানুষটার বাইরের আচার-ব্যবহারে রুচিবিকারের প্রকাশ ঘটেছে—অন্তরের দেবতা এখনও কলুষ-কলঙ্কের নাগালের বাইরে রয়ে গেছে। তরুবালার ইচ্ছে ক'রে, জগদীশকে এই পঙ্ককুণ্ডের মধ্য থেকে উদ্ধার করে নিয়ে গিয়ে, ওর যোগ্য স্থানে

প্রতিষ্ঠিত করতে। তরুবালার মনে হয় যেন, কোনো ভস্মাচ্ছাদিত ভোলানাথের সঙ্গে কোন্ দুর্লভ শুভলগ্নে ওর দেখা হয়ে গেছে।

আত্মসমাহিত জগদীশের পাশে বসে তরুবালা বললে—অত যে রাগ করছ, আচ্ছা বলো তো আমি তোমার কোন্ ক্ষতিটা করেছি?

জগদীশ বিষণ্ণভাবে বলে—সমস্তটাই ত ক্ষতি! এতক্ষণ দুটো চরস-গাঁজা লুকিয়ে বেচলে পাঁচটা টাকাও তো আমদানি হ'ত!

তরুবালা হাসিমুখে বটুয়া খুলে একখানা পাঁচটাকার নোট বার করে জগদীশের হাতে গুঁজে দিতে, জগদীশ বিব্রতভাবে বলে—এসব আবার কি?

—কিছু না, তোমার ক্ষতির খেসারৎ।

—আরে না, না--তোমার টাকার অনেক দরকার। পাঁচটা পুরুষ ধরে রোজগারের আশায় পথে বেরিয়েছ। তোমার কাছ থেকে টাকা নেওয়া অন্যায়। চাইনে।

তরুবালা এ কথার জবাবে হেসে বললে—তা বলে, তুমি পর হয়ে লোকসান সইবে কেন? নাও, নইলে আমার গায়ে বাজবে।

হাতে গোঁজা নোটখানা জগদীশের পকেটে ওঠে না। সে যেন কেমন হয়ে জলের দিকে তাকায়। তারপর একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলে—আমার ঠিক ভালো লাগছে না। পথে দেখা একটা মেয়ে তুমি। তোমার সঙ্গে সঙ্গে এ রকম ঘোরার কোনো অর্থ হয় না। সত্যি বলছি, কাল থেকে সমস্ত ব্যাপারটা কেমন যেন অস্বস্তিকর হয়ে উঠেছে।

তরুবালা বলে—অতো ভাবছো কেন?

অস্বস্তিটুকু ঝেড়ে ফেলার ভঙ্গীতে মাথা নেড়ে জগদীশ বলে—

এভাবে দু'জনে কাছাকাছি থাকলে মায়া পড়তে কতক্ষণ। তাতে মহা সর্বনাশ। এরপর ত পোষা ছাগল হুট্ করে বেচতে মন উঠবে না। যদি ফাঁকা ফাঁকা লাগে ?

তরুবালা ঠোঁট বাঁকিয়ে বলে—তা ব'লে আমাকে ছাগলের সঙ্গে তুলনা করবে !

একবার তরুবালার দিকে তাকিয়ে জগদীশ পুকুরে একটা মাটির টুক্‌রো ছুঁড়ে ফেল্‌ল। তরুবালা দেখল, শান্ত জলে চক্রাকার আবর্ত সৃষ্টি ক'রে মাটির টুকরোটা জলে ডুবে গেল। যেন মনের অতলে এমনি ক'রেই চিন্তার টুকরো তলিয়ে যায়। তরুবালা সেই আবর্তের অসংখ্য চক্রের দিকে তাকিয়ে ভাবনায় গা ভাসিয়ে দিয়েছে।

জগদীশ আপন মনে ব'লে চলে—তা কেন করবো? দশটা টাকা ফেল্‌লেই ত একটা মেয়ে পাওয়া যায়। আর একটা ভালো ছাগল কিন্‌তে যাও অন্তত-পঁচিশটি টাকা ফেলতে হবে।

কথাটা তরুবালা হজম করতে পারে না, বলে—কিন্তু ভালোবাসা, স্নেহ, মমতা ?

জগদীশ তাচ্ছিল্যভরে হেসে ওঠে। তার অভিধানে স্নেহ-প্রীতির স্থান কোথায় ! যে মানুষ জীবনে কখনও প্রীতির স্পর্শ পায়নি, যার দিন কাটে জীবন-সংগ্রামের নিষ্ঠুরতায়। তার কাছে স্নেহ প্রীতি যেন সৌখীন বাগাড়ম্বর। জগদীশের হাসির মধ্যে তীব্র ব্যঙ্গের স্বর বেজে ওঠে। সে হাসতে হাসতে জবাব দিল তরুবালাকে—ভালোবাসা ? মানে, গায়ে ফুর্‌ফুরে হাওয়া লেগে ভারি পুলক হয়েছে, না? মেয়েমানুষ যে, মতলব খারাপ ! আমায় কিন্তু এবার দয়া ক'রে অব্যাহতি দাও !

তরুবালা মনে মনে আঘাত পেয়েছে। ওর সপ্রতিভ সুন্দর মুখের ওপর বেদনার কারুণ্য ফুটে ওঠে। কিন্তু জগদীশের চোখ সেখানে নেই। তার সঙ্গী এ্যাটাচি কেসের দিকে লোভার্ত দৃষ্টি যেন আঠা দিয়ে আটকানো হয়ে গেছে।

দীর্ঘশ্বাস পড়ল তরুবালার বুক নিংড়ে।

একবার জগদীশের নির্বিকার মুখের পানে তাকিয়ে তরুবালা মাটির দিকে চোখ নামালো, বললে—কোথায় যাবে?

ব্যস্তভাবে জগদীশ গা-ঝাড়া দিয়ে উঠে পড়ল, বললে—কাজ-কারবারের ধান্দায় যেতে হবে। তোমার সঙ্গে এভাবে এলোপাতাড়ি ঘুরলে পেট চলবে না।

—তোমার বুঝি অনেক পুঁজি! রোজগার না করলে হাঁড়ি চড়ে না?

—অতো আত্মীয়তা আমার সইবে না। আমার কেউ নেই, বেশ আছি। কেউ হ'লেই ত যতো বায়নাক্কা 'ইহা দাও, উহা চাই, ক্ষীর চাই, মাখন দাও।' কি কাজ বাবা! আপনিটি না কোপ্‌নীটি!

তরুবালা ম্লান হাসি হেসে বলে—কেউ নেই তোমার? আহা, তবে ত' বেশ আছো।

—থাক আর নজর দিতে হবে না। বলে দিচ্ছি সাফ কথা, আমাকে আর ভুগিয়ো না। এই নাকে কানে খৎ, আর যদি মেয়ে-মানুষের ছায়া মাড়াই।

মাঠে ব'সে ব'সে দুজনের সারাদিন কেটে গেল। দেখতে দেখতে সন্ধ্যা হয়ে এলো।

জুয়া

তরুবালা উদাস বিষণ্ণ দৃষ্টি মেলে দিয়ে আকাশ পানে তাকায়। সন্ধ্যে হয়ে এল, বেলা গেল! অথচ তরুবালা অবলম্বনশূন্য ভাবে এই বাঁশবনে পুকুর ঘাটে কাটিয়ে দিল একটি বেলা। কেননা কাজ নেই, নেই কোনো ভাবনা। এ জীবনটা মন্দ নয়। বেশ ভালো লাগছে একা-একা! না, একাই বা বলে কি করে, জগদীশ ত তার সঙ্গে রয়েছে! জগদীশ একটি মানুষ—পুরুষ মানুষ! কিন্তু তার সঙ্গী হয়েও জগদীশ পৃথক। তার সত্তার শেকড় অন্য মাটিতে শক্ত-ভাবে আটকে রয়েছে।

তরুবালার তবু যেন মনে হয়, এ মানুষটার মনের মধ্যে কোথায় যেন অমৃতের আস্বাদ লুকোনো রয়েছে। জগদীশ যখন কথা বলে, এবং যেসব কথা বলে—তা শুনে তরুবালার গা রী-রী করে বিরক্তিতে। বিতৃষ্ণায় ও বিদ্বেষে মন অস্থির হয়ে ওঠে; অথচ জগদীশের মুখের দিকে চাইলেই তরুবালার মন থেকে বিদ্বেষবিষ কোথায় অন্তর্হিত হয়ে যায়। নিজের মনেই তরুবালার দ্বন্দ্ব; জগদীশকে চিনতে ভুল করছি? না, আমার মনের মধ্যেই কোনো বিরাট বিপ্লব ঘটে গিয়েছে?

জগদীশ পড়ন্ত সূর্যের দিকে তাকিয়ে হাতের এ্যাটাচি কেসটা নাচিয়ে বললে—আচ্ছা, তাহলে আসি!

তরুবালা নির্বিবাদে বললে—দাঁড়াও আসছি!

—তার মানে?

—মানে আবার কি? পথটা ত তোমার কেনা নয়।

—তা বলে, আমাকেই তুমি কেনা গোলাম করবে নাকি?

—দেখাই যাক, চলো তো!

—ভাখো, ওসব বাজে কথা রাঁখো। কালকের মতন আজ আবার রাত ঘনিয়ে আসবে। খুকীর মতো ঘ্যান্-ঘ্যান্ ক'রে আমায় বিরক্ত করলে কিন্তু—কিন্তু এবার আমি ভয়ানক রাগ করবো।

—ইস্, আমি তাহলে কামড়ে দেবো না!

—দোহাই, তোমার দাঁতে বিষ নেই ত!

তরুবালা হেসে ভ্রূকুটি করল—বিষক্ষয়ের শক্তি যে তোমার অনেক বেশি, ক্ষতি করতে পারবো না। নীলকণ্ঠ মহেশ্বরের আবার বিষের ভয়?

জগদীশ উৎকণ্ঠিতভাবে বলে—দেখো, একটু নজর রেখে চলো—এই ভাঙা পোড়ো ভিটের মধ্যে অনেক গোখরোর আখড়া!

তরুবালা উল্লসিত হয়ে ওঠে। ওর দু-চোখে কঠিন হাসির ঔজ্জ্বল্য। হা-হা ক'রে হেসে উঠে প্রায় ছুটে এগিয়ে চলে সামনের পোড়ো-ভিটের দিকে।

ব্যস্তভাবে জগদীশ ওর পিছু পিছু ধাওয়া করে—ও কি হচ্ছে? পাগলামি শুরু করলে কেন!

হাসি থামাতে পারে না তরুবালা। হাসতে হাসতে ছুটে চলেছে ও। যেন তার মহৎ সমস্যার চরম সমাধান মিলে গেছে। তরুবালা হাত নেড়ে জগদীশকে বললে—তুমি ফিরে যাও। এসো না, এখানে সাপের বাসা। যদি কামড়ায় ত আর বাঁচবে না। টাকা রোজগার করতে পারবে না। যাও, যাও, ফিরে যাও।

জগদীশ থমকে দাঁড়িয়ে গেল - দোহাই তোমার, ফিরে এসো!

তরুবালা ফেরে না, বলে—এই ত আমার পথ। তুমি ত নিষ্কৃতি চেয়েছ।

জগদীশ গর্জে ওঠে—ছেলেমানুষী ক'র না, প্রাণ নিয়ে খেলা আমি ভালোবাসিনে।

কোন্ কথায় কি কাজ হ'ল অস্তসূর্যের রক্তিম আলোই জানে। তরুবালা ঘুরে আসতে আসতে বললে—তাহলে বল্ছ জীবনটাও একটা মস্ত বড় কারবার?

চুপ করে রইল জগদীশ।

তরুবালা বললে—মনে থাকে যেন, তুমি আমাকে ফিরিয়ে এনেছো। এখন যদি ফেলে পালাতে চাও তোমার ঈশ্বর তোমায় ক্ষমা করবেন না।

—আমি ঈশ্বর মানি এ কথা তোমায় কে বলেছে?

—তোমার মধ্যেকার 'আমি' বলেছে। নইলে, কাল নিশুতি রাতে তুমি আমায় হত্যা করতে। নইলে আজ এই সাপের বাসায় আমাকে ছেড়ে দিয়ে অনায়াসে চলে যেতে তোমার একটুও আপত্তি হ'ত না।

জগদীশ চল্‌তে চল্‌তে বললে—ভুল! মস্ত ভুল করেছ তুমি। যে সওদা হাটে বেচলে দু পয়সা পাওয়ার আশা থাকে সে সওদাকে মাঠে মারা যেতে দেওয়াটা বোকামি! নইলে তোমার ওপর আমার এক কড়াও মায়া নেই, ছিল না, হবে না, হ'তে পারে না।

এ কথার জবাবে তরুবালা মন খুলে উচ্চকণ্ঠে হাসতে শুরু করল। যেন জগদীশের চোগা-চোখা কথাগুলোকে এই হাসির হাওয়া দিয়েই ও উড়িয়ে দিতে পারে, তাই দেখিয়ে দিল।

॥ এগারো ॥

মফঃস্বলের ছোট্ট শহরের যাত্রীশালা নিঝুম। দূরের কোন বিত্তবান জমিদার বাড়ির পেটা ঘড়িতে রাত বারোটার ঘণ্টা বাজলো। চাকরটা এতক্ষণ বসে বসে ঝিমোচ্ছিল। ঘণ্টার শব্দে কানে যেতে সে উচ্চকিত দৃষ্টি মেলে উঠোনের দিকে তাকিয়ে উঠে পড়ল। এবার আজকের মত দরজা বন্ধ করতে হবে। এমন সময়ে যাত্রীশালার সামনে তরুবালাকে সঙ্গে ক'রে জগদীশ হাজির হয়।

চাকরটা চোখ রগ্ড়ে ভালো করে তাকালো। তরুবালার দিকে নজর পড়তে সে সসম্ভ্রমে পথ ক'রে সরে দাঁড়ায়।

জগদীশ প্রশ্ন করে—খালি ঘর আছে হে ?

—আজ্ঞে না! সব বোঝাই। বাবা কালভৈরবের কৃপায় শহরের সব্বত্তরই লোকের ভিড় খুব।

জগদীশ তরুবালার দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলে—তাহলে ?

তরুবালা বলে—তোমাদের বারান্দা টারান্দাতেও একটু জায়গা হবে না!

চাকরটি কুণ্ঠিতভাবে বললে—আজ্ঞে তা রয়েছেন, কিন্তু সে কি আপনাদের মতো মনিষ্যির যুগ্যি ? কষ্ট হবে।

জগদীশ উদ্যোগী হয়ে এগিয়ে গেল যাত্রীশালার বারান্দায়। তরুবালা তার পিছনে চল্‌ল। চাকরটি তাদের দেখে শুনে অন্যত্র চলে গেল। ওদের সঙ্গে যে বিছানাপত্র কিছুই নেই—। ছকুলাল দীর্ঘদিন ধর্মশালার চাকরী করছে, কাজেই সে ভালো ক'রেই জানে, কার কি দরকার হ'তে পারে। আর মানুষের সামান্য উপকার করলে যে, তার বিনিময়ে আর্থিক পুরস্কার পাওয়া যায়, তাও ছকুলালের জানতে বাকী নেই।

তরুবালা বারান্দার চারদিক তদারক ক'রে দেখল উঠানের উপর একখানা তক্তাপোষ দেওয়ালের গায়ে ঠেস দেওয়া রয়েছে—চৌকিটার দু'খানা পায়া নেই।

জগদীশের দিকে তাকিয়ে ও বললে—হ্যাঁ, ওতেই কাজ চলবে! চল ওটা নিয়ে আসি।

চৌকিখানা দুজনে ধরাধরি ক'রে নিয়ে এসে বারান্দায় একটা অস্থায়ী আব্রু তৈরী ক'রে ফেল্‌ল। জগদীশ বললে—বাঃ, তোমার ত এ সব দিকে মাথা আছে!

তরুবালা হাসল—চোখ থাকলে দেখতে পেতে আমার সবই আছে।

চাকরটা ওদের কথার মাঝে এসে পড়ল। তার হাতে একখানা পুরনো সতরঞ্চি আর খান দুই ছেঁড়া চট। ময়লা দুটো বালিশও সে এনেছে।

জগদীশ চাকরটার পিঠ চাপ্‌ড়ে বললে—ব্যস, ঠিক আছে। কাল বকশিশ পাবি।

ছকুলাল একগাল হেসে বললে—বাবুদের খাওয়াও ত হয় নি !

—তা আর কি করা যাবে ?

জগদীশ বললে।

ছকুলাল মাথা হেলিয়ে জবাব দেয়—বাবু, আমি থাকতে আপনাদের কিচ্ছু ভাবতে হবে না। পয়সা দিন না, দোকান বন্ধ হয় নি।

তরুবালার দিকে তাকিয়ে জগদীশ বলে—নিখরচায় খেতে পেলে খুশি হই !

চাকরকে পয়সা দিয়ে তরুবালা মাটির ওপর বসে পড়ল।

জগদীশ চটের ওপর এ্যাটাচি কেস রেখে, আরামের ভঙ্গীতে বসল। একটা সিগারেট বার করে দেশলাইএর ওপর ঠুকতে ঠুকতে বললে – কেমন, এ জায়গাটা মোটের ওপর তোমার উপযুক্ত, কি বলো ?

তরুবালা বললে—আচ্ছা তুমি যে ট্রেনে এলে, তোমার বাড়ি কোথায় ?

জগদীশ এবারে চটের ওপরে শুয়ে পড়ল, এ্যাটাচি কেসটাকে মাথায় বালিশ করে। সিগারেটে টান দিয়ে জবাব দিল—বটে ! তারপর জিজ্ঞেস করবে আমার বাপ চোদ্দপুরুষের নাম ! ওসব কথা থাক, এখন শুয়ে পড়ো।

ব'লে সে তরুবালার দিকে সতরঞ্চিটা ছুঁড়ে দিল, তারপর বালিশ দুটোও।

তরুবালা বললে—বারে আমাকে দুটো বালিশ দিলে কেন ?

জগদীশ নির্লিপ্তভাবে বলে—আহা তুমি যে বড়লোকের মেয়ে একটা মাথার, একটা কোলের ! আর ভাখো, একটা কথা—

—কি ?

—আমি যদি ঘুমিয়ে থাকি ত ডেকো না।

—আগে ঘুমোও—

—না, না, আমি বলে রাখি! নইলে সকাল বেলা ঠেলে তুলে ঘটা ক'রে বল্‌বে—আমায় বিদায় দাও, যাচ্ছি! ওসব নয়। স্রেফ কেটে পড়ো, বুঝলে! কাল সকালে যেন তোমার মুখ দেখতে না হয়।

তরুবালা আহতস্বরে উত্তর দিল—ও, তুমি বুঝি ভাবছো যে যাবার সময় তোমার পায়ের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে হাউ-হাউ ক'রে কাঁদবো।

—না, তেমন মেয়ে তুমি নও।

ব'লে জগদীশ হেসে উঠ্‌ল।

চাকরটা শালপাতায় মোড়া খাবারের ঠোঙা নিয়ে এল।

তরুবালা বললে—রাখো ওখানে।

ছকু বললে—আজ্ঞে থালা আনি, জল দিই।

—বাঃ, তুমি ত বেশ কাজের!

বললে তরুবালা।

চাকরটা আপন কাজ নিয়েই ব্যস্ত, তার মুখে প্রসন্ন হাসি। যেন কাজ করতে পেলেই সে খুশি।

তরুবালা সমস্ত খাবারটাই জগদীশের দিকে এগিয়ে দিল।

উঠে বসে জগদীশ দেখল, প্রশ্ন করল—কই, তোমার রাখলে না।

তরুবালা জবাব দিল—আমি বড়লোকের মেয়ে, তোমার সঙ্গে একাসনে ব'সে খেলে যদি মান খোয়া যায়।

কথাটা গিয়ে সরাসরি জগদীশের বুকে ধাক্কা দিয়েছে। সে একটুক্ষণ মুখ বুজে সামলে নিয়ে বলে—কিন্তু তুমি ত নিজের পয়সা দিয়েই খাবার আনালে!

তরুবালা অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে রয়েছে।

জগদীশের দিকে ও তাকাচ্ছে না।

বেচারী জগদীশ অত্যন্ত বিব্রত হয়ে পড়েছে।

কিন্তু তরুবালার সেদিকে লক্ষ্য নেই। ও বললে--তা হতে পারে। বড়লোকেরা ত চিরকালই গরীব-দুঃখীকে খাইয়ে থাকে।

তরুবালার কণ্ঠস্বরে অভিমানের অগ্নিস্ফুলিঙ্গ।

জগদীশ ওর কথায় শুধু চটেই যায়নি,—ক্ষুব্ধ, আহত ও অপমানে তার ভিতরের পৌরুষ ধিক্কৃত! সে আবেগরুদ্ধ স্বরে বলে—তুমি, তুমি এইভাবে আমায় অপমান করলে?

তরুবালা তীক্ষ্ণ বিদ্রুপের হাসি হেসে বললে—যে মেয়েকে তুমি দরজায় দরজায় বেচতে গিয়েছ, তার কথায় তোমার অপমান হয়?

এই স্তব্ধ মৌন রাত্রি যেন তরুবালার মর্মবেদনায় মুখর হয়ে ওঠে। জগদীশের চোখের সামনে এই মেয়েটার ঔদ্ধত্য অসহ্য। সে অনেক কিছু বলতে চায়, কিন্তু পারে না। ক্ষোভের তীব্র জ্বালায় তার মুখ থেকে শুধু এই কটি কথাই উচ্চারিত হয়—যাদের মানুষ মনে করি নি তাদের অপমানও সইতে পারি নে। তোমার ওই ভিক্ষের খাবার আমি মুখে তুলতে পারব না।

তবু তরুবালা হেসে উঠল। এ এক ভয়ঙ্কর কশাঘাত। এর পরও তরুবালা হাসতে পারল। জগদীশ ভেবে পায় না, কি ভাবে

এই অবাধ্য মেয়েটাকে শায়েস্তা করা যায়। সে আর সহ্য করতে পারে না। ছেঁড়া চট দুখানা গুটিয়ে নিয়ে সে উঠে পার্টিশনের ওপারে গিয়ে একখানে বিছিয়ে শুয়ে পড়ল।

ওপার থেকে তরুবালা ডাকে—শুনতে পাচ্ছ ?

বিরক্তভাবে উত্তর দেয় জগদীশ—কেন ?

হাসিতে পেয়েছে তরুবালাকে। এ হাসির অন্তরালে ওর মর্মন্তুদ বেদনার ক্রন্দন বুঝি ঢাকা পড়েও পড়ে না। কিন্তু জগদীশ কি তা বোঝে ? হয়তো তরুবালা নিজেই তা বোঝে না।

তরুবালা বললে—শেষ রাত্তিরে কোনো মতলব নিয়ে আমার খোলা ঘরে ঢুকে পড়বে না তো ?

জগদীশ আর আদৌ বরদাস্ত করতে পারে না তরুবালার কথা। নাঃ, আর নয়—অনেক সয়েছে সে, অনেক বয়েছে এই পাথর মেয়ের ঝামেলা। সাড়া দেবে না।

তরুবালা সহজে হাল ছাড়তে নারাজ। ও আবার বললে—মট্‌কা মেরে পড়ে রইলে যে। তাহলে বলো, মতলব রয়েছে ?

গম্ভীরভাবে জগদীশ উত্তর দেয়—জানিনে, শেষ রাত্রের মতলব কি এত আগে টের পাওয়া যায় ?

তরুবালা অদ্ভুতভাবে সাড়া দেয় 'হুঁ-উ', তারপর কথার জের টানে—আচ্ছা একটা কথা বলব ?

—বারণ করলেই কি মানবে ? তোমার মতো মেয়েকে ঠেকিয়ে রাখা—!

—আচ্ছা, আমি যদি এখন তোমাকে আদর ক'রে খাওয়াতে বসতুম, তুমি খেতে ?

জগদীশ জবাব দিল—তুমিও সতী নও, আমিও পতি নই! কাজেই ওসব ভিজে-ভিজে কথা কেন? থাক্!

তরুবালার হাসির তরঙ্গ লহর চৌকির পার্টিশনে আছড়ে ছড়িয়ে পড়ে। একটানা হাসি জগদীশের অসহ্য লাগে। সে কানে হাত ঢাকা দিয়ে ঘুম পাড়াতে চেষ্টা করে নিজেকে।

আস্তে আস্তে হাসি থামে। ধর্মশালার হাওয়ায় স্বস্তির স্তব্ধতা।

রাত আরও গভীর হয়। তরুবালা, জগদীশ কেউই কোন কথা বলে না। চাকরটা মুড়ি দিয়ে একপাশে ঘুমিয়ে পড়েছে, তার নাকডাকার শব্দটুকুমাত্র শোনা যাচ্ছে।

চুপ করে গেলেও তরুবালা ঘুমোয় নি।

ঘুমোয়নি জগদীশও। না, সে ঘুমাতে পারে না। ঘুমের পাল্লায় পড়লে কাজ পণ্ড হবে। হাঁ, তার কাজ রয়েছে বইকি। নিশুতি রাতে তরুবালার বটুয়াটা চুরি করতে না পারলে ওই মেয়েকে জব্দ করার অন্য কোনো পথ নেই। অপমান করেছে তাকে তরুবালা, তাকে বিস্তর বিরক্ত করেছে, তার অজস্র ক্ষতি করেছে তরুবালা। অতএব, তরুবালার তহবিল তছ্‌রুপ করলে জগদীশের কিছুমাত্র পাপ হবে না। বরং এটাই অবশ্য কর্তব্য। ঔদ্ধত্যের জবাব শঠতা দিয়েই দেয়! সেই হেতু জগদীশ জেগে রয়েছে।

এক সময় জগদীশ শয্যা ছেড়ে উঠে বসল। পার্টিশনের গায়ে কান ঠেকিয়ে শুনলো—না, কোনো সাড়াশব্দ নেই। ঘুমিয়েছে··· আস্তে আস্তে, পা টিপে টিপে এগিয়ে জগদীশ পার্টিশনের এপাশে মুখ বাড়িয়ে উঁকি দিতেই, তরুবালা সাড়া দিল—এস, এস বুঝতে পেরেছি।

চমকে উঠল জগদীশ। সে চমকে বললে—ও, হ্যাঁ, আমিও তাই ভাবছিলুম। হেঁ-হেঁ, বুঝতে পেরেছ তাহলে? বলো তো কি বুঝেছ?

তরুবালা হাসতে হাসতে বললে—অস্থির হয়ে উঠেছ, তাই না?

আমতা-আমতা স্বরে জগদীশ বলে—হ্যাঁ, তা অনেকটা! মানে, ধরো তাই!

তরুবালা বেশ বিজ্ঞভাবে মাথা নেড়ে উঠে বসল—লজ্জা তোমার ঘুচবে ঠিক জানতুম! এসো,—তুমি যে কি চাও, তা কি আর বুঝি নি? মেয়েমানুষের মন যে…। তা এতই বা মুখচোরা কিসের জন্যে বলো তো! এসো?

আরও একটু কাছে এগিয়ে এল জগদীশ। ধরা কি সত্যিই সে পড়ে গেছে নাকি? জগদীশ বুঝতে পারে না। প্রশ্ন করে—কি, কি বলছ?

হাসি চেপে, মুখ টিপে তরুবালা খাবার এগিয়ে দিল জগদীশের দিকে বললে—ছিঃ, ওইভাবে মুখের খাবার ফেলে যেতে আছে! তখনই বললুম—

জগদীশের বুকের ওপর থেকে পাষাণভার যেন নেমে যায়। কপালের ঘাম মুছে একবার তরুবালার দিকে তাকালো। না, তাহলে ধরা সে পড়ে নি!

তরুবালা আবার খিল-খিল ক'রে হেসে উঠল। জগদীশের যেন মনে হয় এ হাসির মধ্যে শ্লেষের অঙ্কুশ রয়েছে। তরুবালা হাসতে হাসতে বলে—পুরুষ মানুষের খিদে! তা এতক্ষণ ছটফট করছিলে ত। নাও, খাও!

খাবার মুখে দিয়ে জগদীশ অপ্রতিভভাবে তরুবালার মুখের দিকে তাকায়। না, এ মেয়ের মনে অমন কথা থাকতে পারে না! না, না, না। যেটুকু বল্ছে তরুবালা, তার চেয়ে বেশি কিছু বলা ওর উদ্দেশ্য হতে পারে না। জগদীশ বললে—তাও হতে পারে! জল দাও, গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে।

তরুবালা জল দিয়েই আবার হাসতে শুরু করল। এবার ও আর হাসির বাঁধ কিছুতেই সাম্‌লে নিতে পারল না। সে হাসির ছোঁয়াতে জগদীশও হাসতে শুরু করল। কেন? তা ওরা তলিয়ে ভাববার অবকাশ পায় নি। হাসির জোয়ারে মনের মালিন্য নিঃশেষে ভাসিয়ে দিয়েছে।

হঠাৎ একসময়ে জগদীশ বললে—হয় তোমার মাথা খারাপ, নয় ত আমার! এখুনি লোকজন জেগে ছুটে আসবে। থামাও—

—আমি পারছি না।

—তবে আমি পালাই?

—এখনো কোন সাহসে বসে রয়েছ? লোকজন এসে পড়লে দেখে ফেলবে, তারপর বিপদ তোমার।

—কি বিপদ?

—আপদকে ঘাড় থেকে নামাতে পারবে না। টাকা রোজগারের বড় বাধা হবে। আরও কত কি!

—না, না, তার চেয়ে আমি পালাই।

ওপারে গিয়ে জগদীশ হাঁপাতে থাকে। এক নাগাড়ি এতক্ষণ ধরে অকারণে হাসি তার জীবনে এই প্রথম। এবার নিজের ছেলেমানুষির কথা ভেবে রাগ হয় নিজের ওপরই। ধমক দেয় আপনাকে, এসব

ছেলেমানুষি কেন?···অনেকক্ষণ ধরে হাসির ধকল সামলালো জগদীশ।

লোভের দৃষ্টিতে মার্জারের উজ্জ্বলতা! জগদীশের দুচোখ অস্থির, চঞ্চল! সে চোখে ঘুম আর আসে না। ও মেয়েটা যে তাকে ফাঁদে ফেল্‌তে চায় জগদীশের তা বুঝতে আর বাকী নেই। কিন্তু, না, জগদীশ এত সামান্য উৎকোচে নিজেকে হারাতে প্রস্তুত নয়। ওই মেয়েটি তাকে এতই বোকা মনে করে যে,—! যাক, তার যথার্থ উত্তর সে দিয়ে যাবে।

হ্যাঁ, এবার মেয়েটি ঘুমিয়েছে। নিশ্চয়।

জগদীশ পার্টিশনের এপারে এসে চুপ ক'রে দাঁড়ালো। তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়ে তরুবালার মুখখানা দেখলো—নিশ্বাস পড়ছে, দীর্ঘ বিলম্বিত ছন্দে! দুচোখের পাতায় অপূর্ব নিবিড় সারল্য! ঘুমোচ্ছে, তাতে আর কোনই সন্দেহ থাকতে পারে না। কিন্তু সেই বটুয়াটা? যাকে ওরা ভ্যানিটিব্যাগ বলে। সেই বটুয়া! জগদীশের দরকার সেই ব্যাগটা। না, ব্যাগটার ওপর এতটুকু লোভ নেই,—কারণ ওর ভেতরে সাধারণত অবাচ্য বস্তুর জটলা থাকে। তবে ব্যতিক্রমের দুনিয়াতে শেষ নেই!

জগদীশ বিড়ালের মত চারিদিকে চোখ ঘোরায়। বটুয়ার খোঁজ করতে গিয়ে বারেকের জন্য তার দৃষ্টি থম্‌কে আটকে গেল তরুবালার অসম্বৃত বেশের অবকাশে অনাবৃত দেহের উপর। হ্যাঁ, ভালো! কিন্তু—ওদিকে নজর দিয়ে হোঁচট খাওয়া চলবে না। তরুবালার মুঠোর মধ্যে ধরা রয়েছে বটুয়ার লেশটা। মুঠোটা শিথিল—।

জগদীশ ঝুঁকে পড়ে বটুয়াটা টুক ক'রে খুলে নিল। হাঁ, নজর পড়ল বইকি চাঁপাকলি আঙ্গুলগুলির উপর। তবু জগদীশের চিত্তবিকার হয় না। সে যে সাধক! তার সাধনার দেবতা মদন নয়, কুবের—সরস্বতী নয়, লক্ষ্মী।

যেমন সন্তর্পণে গিয়েছিল তেমনি সাবধানে এপারে ফিরে এসে জগদীশ বটুয়াটা এ্যাটাচি কেসের মধ্যে নিয়ে নিল। তারপর সতর্ক নজর রেখে সে দরজার দিকে এগিয়ে গেল। কিন্তু আবার ফিরতে হয় তাকে। জ্যোৎস্না এসে পড়েছে বারান্দায়। কি যেন মনে হয়েছে!

আর কিছু নয়। তরুবালা শুয়ে রয়েছে বারান্দায়। যে রকম অচেতন অবস্থায় ঘুমোচ্ছে ও তাতে ঘুম ভাঙতে বেলা হওয়াই স্বাভাবিক। ধর্মশালার অন্য যাত্রীদের ঘুম ভাঙবে—তারা যদি ওকে অসম্বৃত অবস্থায় ছাখে! না, তার চেয়ে ওর গায়ের কাপড় চোপড় একটু গুছিয়ে দিয়ে যাওয়াই জগদীশের কর্তব্য। হ্যাঁ, এটুকু না করলে অশোভন হবে।

অতএব যে জগদীশ তরুবালার টাকা চুরি করল সেই জগদীশই আবার ফিরে এসে অতি ধীরে স্খলিত আঁচল তুলে তরুবালার গায়ের উপর ঢেকে দেয়!

তারপর সে চলে গেল ধর্মশালার দরজার খিল খুলে।

॥ বারো ॥

যাত্রীশালার জীবন শুরু সকাল থেকে। কলরবে বাড়িখানা মুখর হয়ে ওঠে। চল্‌-চল্‌, গোছ-গাছ, সাজ-সাজ রব। এখানকার জীবনে স্থিরতা বা স্থায়িত্বের কোনো লক্ষণ নেই। চলমান মানব-স্রোতই যাত্রীশালার বিশিষ্ট চরিত্র। কেউ কারো নয়। জনতা আছে, মানুষ নেই।

সকালে ঘুম ভেঙে দু-একজন ঘুমন্ত তরুবালাকে দ্যাখে। ওর শান্ত, সুপ্ত মুখশ্রী যেন সকালের ফুটন্ত ফুল। ঘুম ভাঙলেই পূর্ণ বিকাশ ঘটবে। তরুবালা দু-দিনের শ্রান্তির আচ্ছন্নতায় অচেতন নিদ্রাসুখে ডুবে আছে। একান্ত একটি কোণে ময়লা বালিশে কিছুমাত্র অসুবিধে নেই ওর।

বেলার সঙ্গে সঙ্গে কোলাহল বৃদ্ধি পায়। ঘুমন্ত তরুবালাকে একবার দেখে গেল ছকুলাল। একদল গৃহস্থ যাত্রী মহা হৈ-চৈ লাগিয়ে দিয়েছে চাকরের সঙ্গে বকশিশ নিয়ে। তারা নাকি ছকুলালকে সন্দেহ করে, দোকানদারের সঙ্গে দস্তুরীর বখরা বন্দোবস্ত ক'রে চাল-ডাল-তেল-নুন কিনিয়ে ছকুলাল প্রচুর মুনাফা হাতিয়েছে। ছকুলাল এ কথাতে ভীষণ চটে গিয়েছে। যাত্রীদের কর্তা চতুর্গুণ গলাবাজি করে

বলছেন—তোদের আর আমি চিনিনে। বলে গয়া-কাশী-বিন্দাবন সব ঠেঙিয়ে এলাম। কোথাও একটা কানাকড়ি ঠকাতে পারল না কেউ—হুঁ!

তরুবালা ঘুম ভেঙে চোখ মেলেই এই কথাগুলো শোনে।

এরই মধ্যে একজন বৃদ্ধ উদাত্তকণ্ঠে মোহমুদ্গরের শ্লোক আবৃত্তি করেন শোনা যায়। কা তব কান্তা কস্তে পুত্র ইত্যাদি।

তরুবালা উঠে বসে চারিদিকে চোখ বুলিয়ে দেখল, বেলা মন্দ হয় নি।

জগদীশ কোথায় গেল? সে বুঝি অনেক আগেই উঠে পড়েছে; ছেঁড়া চটগুলোও নেই। এ্যাটাচি কেসও নাই। এ পাশে এঁটো ঠোঙার পাতা, থালা কিচ্ছু নেই।

তরুবালা ঘুরে-ফিরে এদিক ওদিক খুঁজলো—না, জগদীশ নেই। তবে কি সে চলেই গিয়েছে! জগদীশ কি এইভাবে তরুবালাকে পরিহার ক'রে যেতে পারে? ফিরে এসে বসে বসে তরুবালা সেই কথাই ভাবছিল! না, সেটা বিশ্বাস করতে যেন ইচ্ছে হয় না তরুবালার।

ছকুলাল এরই মধ্যে এক ফাঁকে এসে বললে—কাল আপনাদের বড্ড কষ্ট গিয়েছে বৌদিদিঠান। আজ আর ভাবতে হবে না, আমি যখন রইছি! হাঁ দেখুন, এই মাত্তর একখান ঘর খালি হয়েছে। আমি বলি কি তাড়াতাড়ি দখল নিন। কোথা দিয়ে কে চিলের মত ছোঁ মেরে বসবে। চলুন, চলুন। আমি ধুয়ে মুছে ফেলছি। জিনিসপত্তর—

তরুবালা বিষণ্ণ হাসি হাসে—জিনিসপত্তর ত নেই কিছু।

—তাহলে আপনি নিজেই ঘরে গিয়ে বসবেন চলুন। বিছানা-

পত্তর সব ব্যবস্থা হয়ে যাচ্ছে। তা বাবু বুঝি সাতসকালে কাজে বেরুলেন?

তরুবালা বললে—কি জানি কোথায় গেলেন?

—দেখুন দেখি, আপনাকেও বুঝি বলে যান নি? আমি ভোরে ঘুম ভেঙে দেখি দোর খোলা, ইদিকে বাবুও নেই! তা নিশ্চয় খুব জরুরি কাজে গিয়েছেন। আপনার কিচ্ছু ভাবনা নেই বৌদিদি, ছকুলাল যখন রয়েছে তখন আপনি নিশ্চিন্দি থাকুন—এ একেবারে বাঘের পেটের মধ্যে থাকা! যা দরকার হবে, ছকুলাল ব'লে হাঁক দেবেন।

তরুবালা ছকুলালের সঙ্গে ঘর দেখতে এল। তাকে ঘরে ঢুকিয়ে বললে ছকু—এই তক্তাপোষ, ওই জানালা। বুঝলেন, স্নান করতে গেলেও দোর খুলে রেখে যাবেন না। দরজাতেই চাবিতালা রইল। আজ্ঞে আমার বকশিশটা—

তরুবালা মৃদু হেসে বললে—এই দেবো—

—পরেই দেবেন, তার জন্যে কি। ইদিকে এই যে চানের ঘর। নিন্ চানটান করুন। বল্তে বল্তে ছকুলাল চলে গেল।

তরুবালার হঠাৎ মনে পড়ে যায় ভ্যানিটি ব্যাগের কথা। সেটা ত ওর হাতেই ছিল ঘুমোবার সময়। নেই? না, নেই ত! শোবার জায়গাটা খুঁজে এল তরুবালা—না, সেখানেও নেই।

বুঝতে তরুবালার বিশেষ বিলম্ব হয় না। জগদীশ নেই, অতএব টাকার থলিটাও সেই সঙ্গে নেই!

তিক্ততায় তরুবালার সারাটা মন ভারি হয়ে ওঠে। ছিঃ-ছিঃ-ছিঃ! শেষে সামান্য ওই ক'টি টাকার মায়া কাটাতে পারল না

জগদীশ? এ সেই আত্মভোলা মানুষ। এ সেই মানুষ যে, জগতে আগুন ধরে গেলেও এতটুকু ভ্রূকুঞ্চিত করে না, তাচ্ছিল্যভরে মুখ ফিরিয়ে থাকে। না, না, তরুবালার বিশ্বাস করতে রুচিতে আটকায়। কিন্তু দু'দিন ধরে জগদীশের যে পরিচয় পেয়েছে তাতে আর অবিশ্বাসের কি থাকতে পারে! বরং এটাই জগদীশের পক্ষে অত্যন্ত স্বাভাবিক।

যাক্, যদি ক'টা টাকা নিয়েই ওর মন ভরে ত তাই নিক্।

কিন্তু তরুবালার বেদনা সেজন্য নয়—জগদীশের ওপর ওর অনেক আশাভরসা অঙ্কুরিত হয়ে উঠ্ছিল। সে সবই ছিঁড়ে-কেটে তচ্‌নচ্ ক'রে দিয়ে জগদীশ অন্তর্হিত হয়েছে। এতবড় পরাজয়ের জন্য তরুবালা প্রস্তুত ছিল না।

চৌকির ওপর বসে বসে সাত-পাঁচ ভাবছিল তরুবালা।

এবার তাহ'লে সত্যিই ও যথার্থ একাকী হয়ে পড়ল। তা বেশ ভালোই হ'ল। কি হবে জঞ্জালে আট্‌কা পড়ে! মা-বাপ, ভাই-বোনের মায়া কাটিয়ে যখন তরুবালা মামাবাড়ির নাম করে পথে বেরিয়েছিল তখনই ত একাকীত্বের, নিঃসঙ্গতার জন্য তৈরী হয়েছিল।

হাতে পয়সা নেই। অথচ বয়সটাও ভালো নয় তরুবালার। এই দু'দিনের বিচিত্র অভিজ্ঞতা দিয়ে তরুবালা নিজের বয়সের বিপদটা বেশ ভালোভাবেই টের পেয়েছে। হ্যাঁ, এর জন্য জগদীশকে ধন্যবাদ দিতেই হয়।

আবার মনে পড়ল একটি কপর্দকও ওর হাতে নেই। নজর পড়ল হাতের উপর। তা পয়সা না থাক, হাতে চার গাছা চুড়ি ত রয়েছে!

তবে আর এত ভাবনা কিসের! আপন মনেই হেসে উঠল তরুবালা। আপাততঃ এই চুড়ির দৌলতে চল্‌বে কয়েকটা দিন।

তরুবালা ডাকলো ছকুকে।

ছকুলাল বশম্বদ হাসি নিয়ে হাজির—কি বল্‌ছেন বৌদিদি?

—ছাখো ছকুলাল, আমার একটা কাজ তোমায় করতে হবে।

সব শুনে ছকুলাল ঘাড় কা'ত ক'রে বললে—এর জন্যে আর অত ভাবছেন কেন। আমি এখুনি বেচে দিয়ে টাকা আনছি। হাতে হাতে নগদ টাকা নিয়ে তবে আসবো।

তরুবালা হেসে বললে—এই নাও দু'গাছা চুড়ি। আর ছাখো, আমাকে খানতিনেক খাম আর দু'খানা পোস্টকার্ড এনে দেবে। আর ছাখো শাদা কাগজও এক আনার এনো—হ্যাঁ ওতেই হয়ে যাবে।

—আচ্ছা। আপনি ইদিকে চান করুন। বেলা গড়িয়ে যাচ্ছে।

—হ্যাঁ এই যাই। তুমি বেশি দেরি ক'র না, আমাকে যেতে হবে আবার।

—না, না, যেতে আসতে যা সময় লাগবে। আপনি চান করতে করতেই ফিরবো। উদিকে আপনার রান্নাবাড়ির ব্যবস্থাও করিয়েছি।

—বেশ বেশ। এসো তাহলে।

ছকুলাল চলে যাবার পর তরুবালা খানিকটা নিশ্চিন্ত হ'ল। হাতে আরও দু'গাছা চুড়ি রয়েছে সম্বল। থাক এখন,—ও দুটো হয়তো এর চেয়েও বিপদের দিনে কাজে আসবে।

ছকুলাল ফিরে এসে দেখল তরুবালা ছিম্‌ছাম্ হয়ে বসে রয়েছে।

ওর বেশবাস বদলায় নি, তবে সাজগোছের গুণে মনে হচ্ছে যেন পরিচ্ছন্ন পবিত্রতায় ঘেরা একটি প্রতিমা।

তরুবালা তাকে দেখে তাকালো।

কিছু বলবার আগেই ছকুলাল আরম্ভ ক'রে দিল—বুঝলেন বৌদিদি, আজকাল বাগে পেলে কোনো শালা রেয়াৎ করে না। আপনার চুড়ি বেচতে গিয়ে ফ্যাসাদ—দোকানদারের কতো জেরা! শেষমেস দেড়শ' টাকার এক পয়সাও বেশি আদায় করা গেল না!

তরুবালা খুশির স্বরে বলে—দেড়শ', তা বেশ দিয়েছে।

—আর ওই থেকে আপনার খাম পোস্টকার্ড নিয়ে এলাম।

—আচ্ছা!

টাকাগুলো হাতে নিয়ে তরুবালা প্রথমেই ছকুলালকে পাঁচটা টাকা বখশিশ দিল। আশাতীত বখশিশে ছকুলালের মুখে চোখে খুশি উপ্‌ছে পড়ে। সে বললে—নিন, এবার তা'লে আপনার ঠাঁই এখানেই করে দিই—এই হয়ে এল রান্না। খেয়ে উঠেই যেতে হবে বুঝি? বলবেন, গাড়ি ডেকে দেবো।

তরুবালা খাম-পোস্টকার্ড হাতে নিয়ে একটুক্ষণ চিন্তা করল, তারপর বললে—গ্যাখো ছকু, তোমাদের এ জায়গাটি বেশ। আজ আর যাবো না!

—কি যে বলেন বৌদিদি, আপনাদের যুগ্যি কি এ জায়গা! বড়লোক আপনি—

বড়লোক কথাটা তরুবালার কানে গিয়ে বাজে। আরও একজন ঠিক এই কথাই বলেছিল বটে। সে কথায় তরুবালা অন্তরে আঘাত

পেয়েছিল, শুধু আঘাত পেয়ে হজম করে নি—দ্বিগুণ অপমানের আকারে সে আঘাত ফিরিয়ে দিয়েছিল।

কিন্তু ছকুলালের কথায় এখন তরুবালা হাসলো—কি করে বুঝলে যে বড়লোক? আচ্ছা ছকু, বড়লোকেরা বুঝি হাতের চুড়ি বিক্রি করে?

সলজ্জ হাসি হেসে ছকু বললে—আজ্ঞে, ও আমরা এক নজর দেখলেই বুঝে ফেলি।

তরুবালা এবার হেসে উঠল। বললে—ছকুর কি বুদ্ধি!

ছকুলাল উৎসাহিতভাবে বলে—একটা কথা বল্‌ব, বৌদিদি?

—কি?

—বাবু বুঝি রাগ করেছেন?

—কে বললে?

—আপনি কিচ্ছু ভাববেন না, এবেলাই ফিরবেন। আপনার মনে কষ্ট দিয়ে কি পালিয়ে থাকতে পারেন?

তরুবালার ইচ্ছে করে উচ্চকণ্ঠে বলে, ও আমার কেউ নয়। গিয়েছে—যাক্, আর যেন ফিরে না আসে। কিন্তু কি ভেবে চুপ ক'রে রইলো।

ছকুলাল একটু চিন্তিতভাবে বলে—আপনি বললেন তাই চুড়িটা বেচে দিলাম, এখন ভাবছি বাবু ফিরে আবার এইজন্যে আমাকে না দোষ দ্যান!

তরুবালা বললে—তোমার আবার দোষ কিসের?

—না, তাই বল্‌ছিলাম। আমার কোনো ঘাট নেই, আমি ত হুকুমের চাকর।

একটু গম্ভীরভাবে তরুবালা বলে – আমার জিনিস আমি বেচতে বলেছি। তা নিয়ে তোমাকে কিছু ভাবতে হবে না। ছকু, তোমার কাজ করো গিয়ে।

ছকুলাল মনে মনে বলে, বড়লোকদের ব্যাপারই আলাদা। কখন যে কি মেজাজ হয় বোঝা ভার।

॥ তেরো ॥

এবার নিশ্চিন্ত। জগদীশ খুশিতে উপ্‌ছে পড়ে। ঠিক হয়েছে। এমনি করে না হ'লে কি প্রতিশোধ নেওয়া হয়! আজ পর্যন্ত তাকে আর কেউ টেক্কা মেরে বেরিয়ে যেতে পারেনি। আর ওইটুকু একটা মেয়ে কি না, নাগাড়ে জগদীশের ঘাড়ে ভূতের মত চেপে নাকে দড়ি দিয়ে ঘুরপাক খাইয়েছে! এইবার বুঝতে পারবে মেয়েটা কার সঙ্গে রং-তামাসা করছিল। আগুনে হাত দিয়েছে তা পুড়বে না একটু —এমনটা দুনিয়াতে কস্মিনকালে কেউ শোনে নি। অতএব—।

পরমানন্দে জগদীশ এখন ভবের হাটে কেনাবেচার ফলাও কারবার চালিয়ে যাবে। মেয়েমানুষের ফাঁদে পা দেবার পাত্র সে নয়। তার চাই টাকা। টাকার পাহাড় তৈরী ক'রে সেখানে চড়ে দুনিয়ার মুখে থু-থু ফেল্‌বে একদিন—এই তার স্বপ্ন। না, টাকা ছাড়া একটি মুহূর্তও সে বাঁচবে না—বাঁচতে চায় না!

হাটতলা ছাড়িয়ে ময়দানের ওপর মস্ত মেলা বসেছে। সেখানে অনেক লোকের ভিড়। আর ভিড়ের মধ্যেই ত বেবাক-বেকুবের ঘোরাফেরা। একটুখানি চোখ খুলে রেখে তুমি চলো। দেখবে টাকা এসে তোমার পকেটে সুবোধ বালকের মতো সুড়-সুড় করে

ঢুকে পড়ছে। তবে ওই নজরটুকু চাই—ওটাই হচ্ছে তোমার সহায় সম্বল ভরসা ভাগ্য, যা বল্‌তে চাও তাই!

এখানে বুঝি তাঁবু পড়েছে? কিসের? ও, সার্কাস পার্টি। আচ্ছা! জগদীশ একে-একে খতিয়ে সব দেখছে। এখন আর তার কোনো ভাবনা নেই। পিছনে সেই ফেউ-লাগা মেয়েটা নেই—হাঁপ ছেড়ে বেঁচেছে জগদীশ। মুক্তির চরম মুহূর্তে সে কেবলই নিজেকে বোঝায়, ছাখো তুমি কি আরামে চল্‌ছ। এখন তোমায় কেউ বল্‌বে না, আমায় কিনে নাও। কেউ বলবে না, এসো এই ছায়াতে একটু বসি।...বাঁচা গেছে বলে বাঁচা গেছে! একেবারে নিষ্কৃতি! নিজের পিঠে মনে মনে বাহাদুরির পিঠ চাপড়ানি দিয়ে জগদীশ বলে —সাবাস্‌, জিতা রহো বেটা! এই না হলে মরদ! মেয়ের আঁচলে বাঁধা চাবির থোকার মত যেসব পুরুষ—তারা যে কতদুর মূঢ় তা জগদীশ আজ এই মুহূর্তে নতুন করে বুঝতে শিখল।

নাগরদোলায় ছেলেমেয়েরা ঘুরপাক খাচ্ছে, উঠছে, চড়ছে, ঘুরছে নামছে -বাঃ কি মজা! কি উল্লাস ওদের মুখে! ওদের মুখচ্ছবির মধ্যে জগদীশ যেন নিজের মুখখানা মিশিয়ে দিল।

কয়েক মিনিট। সামান্য মিনিট কয়েক পরেই জগদীশ অন্যদিকে চলে যায়। নাঃ, এসব ছেলেমানুষির বয়স কবে চলে গেছে। আহা সেই বয়সে কেন জগদীশ নাগরদোলায় চড়েনি!

প্রাজ্ঞ জগদীশের কানে লাউড স্পীকারের গান কোনো ভাবোদ্রেক করতে পারে না। এসব অনেক সে শুনেছে।

কোলাহল! জনারণ্য!

জগদীশ খুশি মনে মেলার মধ্যে নিজেকে মিশিয়ে দিল। ওখানে

কি? বাঃ কলের পুতুলে খ্যামটা নাচছে! বাঁশী বাজছে নাচের তালে তালে…ও মশাই, হাঁ ক'রে দেখছেন কি ইদিকে আপনার পকেট মারা গেল যে! জগদীশ দেখচে পকেটমারের হাতসাফাই-এর কায়দা। মনে মনে হেসে নিল কিন্তু মুখ ফুটে টুঁ শব্দটি করল না। এসব হচ্ছে কারবারের রীতি, ভদ্রতা! এটুকু মন্ত্রগুপ্তি না থাকলে কি কারবার চলে! দেখবে, শুনবে, বলবে না।

সার্কাসের একটি মেয়ে ডিগবাজি দেখিয়ে হরদম হাততালি কুড়োচ্ছে। আহা! ওরকম কেরামতি যে কেউই দেখাতে পারে! তবে কেন লোকে হাততালি দিচ্ছে? ও যে ডবকা মেয়ে। ডিগবাজি যারা দেখছে তারা অনেক কিছুই দেখতে উৎসুক—ও মেয়ের আঁটা গেঞ্জির পোশাকে দেহের গঠনের সুস্পষ্ট আভাসও মিলে যাচ্ছে!

পুতুল সাজানো দোকানে খদ্দেরের মোটে ভিড় নেই। এখনই কেন এখানে লোকে আসবে? আগে রং-তামাসা দেখে ক্লান্ত হয়ে পড়ুক, তারপর ত ছেলেমেয়ের জন্যে আহ্লাদী পুতুল, ঘাড়-নড়নড়ে বুড়ো, গিন্নীর ফরমায়েসী কুলো-ডালা কিনবে!

জগদীশ একটা চায়ের দোকানে এসে বসল। খিদেও পেয়েছে।

চায়ের ভাঁড়ে চুমুক দিয়ে তার মনে পড়ল, তরুবালার কথা। এখন কি করছে, কে জানে। হয়তো হাতে পয়সা নেই বলে মেয়েটার একটু চা জোটে নি। পরক্ষণে নিজের এই দুর্বলতাকে ভ্রূকুটি করে জগদীশ বললে মনে মনে– মেয়েমানুষের জাত, ফন্দিফিকির ক'রে ঠিক কাজ গুছিয়ে ফেলবে। ভোজবাজির আসরের দিকে তাকিয়ে জগদীশ নির্লিপ্ত ভাবে চা খায়, গরম সিঙ্গাড়াও দুটো ফরমাস দিয়ে ফেলল।

ওই, সেই ডিগবাজি খাওয়া ডাগর মেয়েটা না? হ্যাঁ, ওই ত চলেছে। মেয়েটার পিছুপিছু গুটিকয়েক লোক চলেছে। লোকগুলোর চোখে যেন কুকুরের চাউনী। জগদীশ তাচ্ছিল্যভরে হেসে উঠল। এমন সময়ে পকেটমারটি দোকানে এসে বসল।

মেয়েটা গেল কোথায়? হ্যাঁ, ঠিক জুয়ার আড্ডায় গিয়ে জুটেছে।

চায়ের পর্ব চুকিয়ে জগদীশ জুয়ার আস্তানায় গেল। সেখানে মেয়েটা বালা খেল্‌ছে। ওর চোখে মুখে প্রবল উত্তেজনা। আশপাশে অনেক লোক জমেছে।

বালা খেলাতে মেয়েটা প্রথমে হেরে গেল। কিন্তু দম্‌ল না। পুনরায় দোকানীকে পয়সা দিয়ে বালাটা নিল; ওর ধারণা যে, একবার হেরেছে কিন্তু এবার উশুল করে নেবে লোকসান। জগদীশ একপাশে দাঁড়িয়ে শান্তভাবে খেলা দেখছে। মাঝে মাঝে জ্বলন্ত সিগারেটে টান দিয়ে আগুন জাগিয়ে রাখছে জগদীশ। মেয়েটা অনবরত হারছে। পরক্ষণে অপমানের গ্লানি কাটাবার জন্য দ্বিগুণ বাজি রেখে আবার খেলছে। এমনি করে এক সময়ে নৈরাশ্যে ওর দু'চোখ ছল্‌ছলিয়ে আসে। তবু খেলবেই। একবার ওকে জিততে হবে, এই সংকল্প।

কিন্তু হ'ল না। শেষ সম্বলটুকু যখন নিঃশেষিত হয়ে গেল তখন মেয়েটা ডুক্‌রে কেঁদে উঠল। কি হবে? ওর যা কিছু ছিল সব যে চলে গেল। এতদিনের উপার্জনের পুঁজি এমনি করে উড়ে গেল—এখন কি উপায়?

জনতার একাংশ মেয়েটির কান্না দেখে দুটো মিষ্টি কথা বলে।

মুখের দুটো সান্ত্বনার কথা দিয়ে এতবড় ক্ষতিটার কণামাত্র পূরণ হবে না। মেয়েটা আরও জোরে কাঁদতে থাকে।

এবার জগদীশ এগিয়ে আসে। শান্ত, দৃঢ় তার পদক্ষেপ।

মেয়েটার কান্নায় জুয়াড়ি দোকানীর বিন্দুমাত্র করুণা হয় না।

এগিয়ে এসে জগদীশ বললে—আমি খেলবো। পাঁচ টাকা বাজি। এই যে ইদিকে বালা দাও।

জগদীশ প্রথম বার নিতান্ত আনাড়ির মতো খেলল এবং হেরে গেল। জুয়াড়ি খুশি মুখে তার দিকে তাকায়। এবার জগদীশ বললে—এবার রইল দশ টাকা। কই বালা দাও।

জুয়াড়ি ব্যগ্র ভাবে বালাটা দিল। জগদীশ এবারও পরাজয় বরণ করল।

ওদিকে উৎসাহী দর্শকের ভিড় জমে গেল। আশপাশে সবাই প্রবল উদ্দীপনায় ঠেলাঠেলি ক'রে এগিয়ে আসতে চায়।

জগদীশ এবার বেশ জোরগলায় ঘোষণা করে—আচ্ছা, এবার পঁচিশ টাকা।

চমকে উঠল অনেকে। কেউ কেউ মুখ টিপে হাসে। ভাবে এ লোকটা ত আচ্ছা বোকা, একটু আগে মেয়েটার সর্বনাশ হ'ল সেটা কি ওর চোখে পড়েনি?

ওদিকে মেয়েটিও খানিকটা শান্ত হয়েছে। একটা লোক হারতে শুরু ক'রেছে—এই বার্তা ওর কানে যাবামাত্র চোখের জল মুছে ভিড় ঠেলে মেয়েটি এগিয়ে আসতে চেষ্টা করে।

এবারও জগদীশ জিতলো না। অল্প টাকা জিতে কি হবে?

তার পরাজয় দেখে মেয়েটি চঞ্চল হয়ে ওঠে।

জগদীশ এবার আরও গলা চড়িয়ে হাঁকে—কুছ পরোয়া নেই, পঞ্চাশ।

এ কি কাণ্ড, বালাটা নির্ভুল সন্ধানে পৌঁছে বাজি জিতে ফেল্‌ল!

চারিদিক থেকে জনতা হৈ-হৈ করে জগদীশকে সম্বর্ধনা জানালো! কামাল-কামাল রব উঠল।

টাকা ক'টা পকেটে রেখে জগদীশ নির্লিপ্ত ভাবে জুয়াড়িকে বললে —কি, আর খেলবে ভাই?

জুয়াড়ি জোর গলায় জবাব দিল—হাঁ-হাঁ আলবৎ! যত টাকা খুশি খেলে যাও, কুছ পরোয়া নেই।

একটু হেসে জগদীশ বললে—দাও, বালা দাও।

বালা হাতে নিয়ে জগদীশ চারিদিকে চোখ বুলিয়ে বললে— আপনারা সবাই শুনুন—বাজি এবার পাঁচশো টাকা।

জুয়াড়ি চম্‌কে উঠল। তার চোখের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ, সন্দিগ্ধ। সার্কাসের সেই মেয়েটির চোখে বন্য উন্মত্ততা! জনতার মধ্যে হৈ-হৈ রব। লোকটা বলে কি? পাঁচশো টাকা! লোকটা কে?

জগদীশের চোখে মুখে বিন্দুমাত্র উত্তেজনার লেশ নেই। সে ঠোঁটের কোণে সিগারেটটা বাঁকিয়ে ধরে অবলীলাক্রমে বালা ছুঁড়ল।

শত-শত উদ্‌গ্রীব চোখের সামনে বালাটা অব্যর্থ সন্ধানে পৌঁছলো।

হাততালির চোটে কানে তালা লাগবার উপক্রম। পিছনের দর্শকেরা উল্লাসে নৃত্য করতে থাকে। মাথা হেঁট করে জুয়াড়ি জগদীশকে টাকা গুণে দিল। কিন্তু তার চোখের কোণ বেয়ে অশ্রু ধারা নেমেছে।

শান্ত জগদীশ টাকা গুণে নিয়ে গম্ভীরভাবে বললে—এবার হাজার টাকা খেলবো কিন্তু।

জুয়াড়ির দিকে তাচ্ছিল্যভরে তাকিয়ে জগদীশ প্রশ্ন করল—কি, রাজি আছো ?

প্রথমে জুয়াড়ির চোখ দুটো হিংস্রতায় জ্বলে ওঠে। কিন্তু পরক্ষণে সে সংযত হয়ে নিজের উত্তেজনা সামলে নিল। একটু এগিয়ে এসে জুয়াড়ি জগদীশের পা জড়িয়ে ধরে—আমাকে মাপ করো, রাজা !

ভিড় ঠেলে জগদীশ বেরিয়ে আসে। তার পিছনে পিছনে জুয়ার আড্ডার লোকজন ভেঙে এধার ওধার চলে গেল। আর তামাসার জৌলুস নেই। এরপর এক-আধ টাকা খেলা কি আবার কেউ ছাখে নাকি !

একটু দূরে এসে জগদীশ সার্কাসের সেই মেয়েটাকে ইসারায় ডাকল।

ছল-ছল চোখে মেয়েটি এগিয়ে এল ? ওর চোখে জগদীশ যেন পরম আশ্চর্য জীব।

—কি নাম তোমার ?

মেয়েটির চোখে চটুলতা উচ্ছল, ও ঘাড় দুলিয়ে বলে—ল-ছ্-মী-ই !

—কত টাকা হেরেছো ?

মেয়েটি আবার কেঁদে ফেল্‌ল। ওর মনে টাকার শোকটা নতুন ক'রে জেগে উঠেছে—সব গ্যাছে আমার। পুরো এক শো টাকা ধার করা টাকা—হুঁ-উ।

জগদীশ বলসে—ও লোকটা জোচ্চোর, জানতে না তুমি ?

—না—

—আর খেলায় শখ আছে ?

—না, মোটে নেই। আমি দিব্যি করে বল্‌ছি। আমার ঘরে ফেরার পয়সাটিও নেই। সব গ্যাছে।

লছমী ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে।

—সব গ্যাছে ? ঘরে ফেরার পয়সা নেই ! চম্‌কে উঠল জগদীশ। লছমীকে বললে—এই নাও তোমার একশো, আর এই গাড়ি ভাড়া। যাও—এবার বাড়ি যাও।

অপ্রত্যাশিত ভাবে হারানো ভাগ্যকে এ ভাবে কুড়িয়ে পেয়ে মেয়েটি খুশিতে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল। হাতে টাকাগুলি পেয়ে সে ছুট্‌তে শুরু করল। কিছুদূর গিয়ে সে একবার ফিরে দেখল চেয়ে জগদীশকে !

মেয়েটি চলে যাবার পর জগদীশ আবার জুয়ার আড্ডায় ফিরে গেল। তাকে দেখে জুয়াড়ি ম্রিয়মান হয়ে যায়। তাকে জগদীশ ডাকল—শোনো।

অনিচ্ছাসত্ত্বেও সে এগিয়ে এল, সগুপরাজয়ের লোকসান কি এইটুকু সময়ে কেউ ভুলতে পারে ? কাছে এসে বিরসকণ্ঠে বললে—আবার কি ?

—এই নাও তোমার টাকা।

এতবড় বিস্ময়ের জন্য জুয়াড়ি আদৌ প্রস্তুত ছিল না। পরন্তু এ যে কল্পনাই করা যায় না। বিস্ময় বিস্ফারিত দৃষ্টিতে জুয়াড়ি জগদীশের দিকে তাকিয়ে বলে—এ তুমি করছ কি রাজা! জুয়ায় জিতে সে টাকা কেউ ফেরৎ দেয় ?

হাসতে হাসতে জগদীশ বললে—এ তো জুয়া নয়, জুয়াচুরি হে! চুরি তবু সহ্য হয়, কিন্তু জুয়াচুরি আমি সইতে পারি নে। ও তুমি নিয়ে নাও হে।

জগদীশের কাণ্ডকারখানা দেখে জুয়াড়ি টাকা হাতে নিয়ে হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে—তার চোখের সামনে থেকে জগদীশ চলে যায়।

তামাসার রং যেন ফিকে লাগে তার চোখে। তবু ঘুরে বেড়ায়। হাতের এ্যাটাচি কেসটা যেন বড় বেশি ভারি হয়ে উঠেছে। কার্নিভ্যালে মহা হুল্লোড় চলেছে। জগদীশ নির্বিকার ভাবে তার পাশ দিয়ে যাচ্ছিল, হঠাৎ মেয়েলি গলায় কে যেন ডাকল—অ বাবা, অ ছেলে!

জগদীশ ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে ফিরে চাইল।

রাঙাদি কাছে এগিয়ে এসে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখে খুশি হয়ে বললেন —গোপাল গোপাল তুমি না বাবা সেই ছেলেটি! সেই ট্রেনে দেখা? আহা খাশা ছেলে।

জগদীশ বুঝতে পারে না কিছুই, বললে—আমাকে কিছু বল্‌তে চান?

রাঙাদির কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হয়ে আসে, আবেগ থর-থর স্বরে বলেন—বল্‌ব কি বাবা, আমার সেই নাত্‌নীটি, যে তোমার ইয়ে জামা পুড়ে যাওয়া দেখে চিল্লে উঠেছিল। তাকে খুঁজে বেড়াচ্ছি বাবা। সে যে কোথায় হারালো! গোপাল, গোপাল। আমার বড় বিপদ বাবা!

জগদীশ উদাসীনভাবে বলে—হারিয়েছে, না, গা-ঢাকা দিয়েছে?

জিভ্‌ কেটে রাঙাদি বললেন—ষাট বালাই! ওকথা ব'ল না বাবা! সে কি হয়, সে যে মস্ত ঘরের মেয়ে গা! হায়-হায়, তাকে না পেলে এ পোড়ার মুখ নিয়ে ফিরবো কি করে গা!

বল্‌তে বল্‌তে রাঙাদি কেঁদে ফেললেন। জগদীশ থম্‌কে দাঁড়িয়ে পড়ল।

ওদিকে রঘুনাথ দাস ওরফে দেশসেবকটি জগদীশকে দূর থেকে লক্ষ্য করে।

জগদীশ রাঙাদিকে প্রশ্ন করে—আপনার নাত্‌নী কাদের বাড়ির মেয়ে?

রাঙাদি উচ্ছ্বসিত স্বরে বলেন—ওমা, বেলবাগানের চৌধুরী যে ওরা, কুলকাঠির জমিদার।

চম্‌কে উঠল জগদীশ। বাইরে বিন্দুমাত্র সে ভাব প্রকাশ হতে দেয় না, পূর্ব্ববৎ নির্লিপ্ত স্বরে বললে—কুঠিঘাটের হরচৌধুরীর কেউ? সেই যে মন্দিরওলা বাড়িটা।

প্রায় হৈ-হৈ করেই রাঙাদি বলেন—ওমা আমার কি হবে! তুমি যে দেখচি সব জানো বাবা! ওই ত হরচৌধুরীরই মেয়ে গা। গাঁ সম্পর্কে আমার নাত্‌নী! গোপাল, গোপাল। দুনিয়ার সবাই চেনে—ওদের কী নামডাক।

জগদীশ হাতের চেটো উল্টে জবাব দিল—দেখুন, যদি পেয়ে যান—পৃথিবী গোল ত!

রাঙাদির পাশ কাটিয়ে জগদীশ চলতে শুরু করে। মনে মনে একটু হাসে, ভাবে, তরুবালাকে খবরটা দিতে পারলে সুন্দর হ'ত। কিন্তু, না থাক। কি হবে? আবার তার মনের মধ্যে তরুবালার অনেক কথা উঁকি ঝুঁকি দিতে শুরু করে।

জগদীশ খানিকটা দূরে চলে যাবার পর রঘুনাথ এসে রাঙাদির সঙ্গ নিল।

রাঙাদি ইদিক উদিক নজর রাখতে রাখতে চলেছেন। পিছন থেকে রঘুনাথ এসে ধরল—বুড়ি মা, একটা কথা বলছিলুম।

রাঙাদি মুখ ঘুরিয়ে রঘুনাথকে দেখে বললে—কে বাবা তুমি, কি বলছ?

—আমাকে তুমি চিনবে না। কিন্তু ওই ছোকরার সঙ্গে কি বলছিলে? ও মোটে সুবিধের লোক নয়।

—সে কি গা! দিব্যি ফুটফুটে সোন্দর ছেলে য্যা—এঁ্যা!

—তা বটে রাঙামূলোর মতো রূপটি রয়েছে। তা যাক, তুমি বুড়ো মানুষ! টাকা পয়সা কিছু হাতিয়েছে নাকি তোমার কাছ থেকে?

করুণ দৃষ্টিতে রাঙাদি রঘুনাথের দিকে তাকিয়ে বললেন—না টাকা পয়সা ত নয়।

—তুমি আমায় নির্ভয়ে বলো। যদি তোমার কোনো বিপদ হয় ত ও হতভাগাকে ঠিক শায়েস্তা করব। ওটা পয়লা নম্বরের নচ্ছার বদমাস!

কেঁদে ফেললেন রাঙাদি—ও মা আমার কি হবে! আমার নাত্‌নী হারিয়েছে, তাকে খুঁজে পাচ্ছিনে তাই বলছিলুম! ট্রেনে সিদ্‌নে ও আর আমরা এক সঙ্গে এখেনে এলুম কি না। তা ও যদি দেখে থাকে—

রঘুনাথ একটু ভেবে নিয়ে বলে—বটে! পরশু বিকেলের গাড়িতে? আরে আমিও ত সেই ট্রেনেই এলুম। তোমার সঙ্গে

বুঝি একটি ডাগর-ডোগর আইবুড়ো মেয়ে ছিল! ও তাকেও দেখিচি—খুব ছট্‌ফটে মেয়ে!

রাঙাদি এবার রঘুনাথের ডান হাতখানা ধরেন—বাবা, আমার হয়েছে মাথার ঘায়ে কুকুর পাগল! বড় ঘরের বড় মেয়ে, কিছু একটা ঘটলে মান সম্ভ্রম যাবে! কার মনে কি আছে জানিনে? কি হবে?

রঘুনাথ সন্দিগ্ধভাবে মাথা নাড়ে—উঁহু ওকে বিশ্বাস ক'রে ভালো করো নি! যাক, দেখি কি করতে পারি। তা তুমি এখেনে থাকো কোথায়?

রাঙাদির দু-চোখ অশ্রু ছলছল, তিনি বললেন—আমার আবার থাকা! রাতখানা গিয়ে পড়ে থাকি বাবা কালভৈরবের মন্দিরে! আর দিনমান পাগলের মতো খুঁজে বেড়াই—সোমত্থ মেয়ে! গোপাল, গোপাল।

রঘুনাথ বললে—ঠিক আছে।

সে আর রাঙাদির সঙ্গে কথা বলে সময় নষ্ট করে না—এখন জগদীশের ওপর কড়া নজর রাখতে হবে তাকে। সে চলল জগদীশের ছায়া অনুসরণের জন্য। মনে মনে প্রতিশোধের স্পৃহা তার তাবৎ উৎসাহে রসদ জোগায়।

॥ চৌদ্দ ॥

ভালো লাগে না। জগদীশের মনের মধ্যে কোথায় যেন কি এক বিপর্যয় ঘটে গেছে। এত লোকজন আমোদবাজির হাজারো আয়োজন, অর্থ-উপার্জনের বিবিধ স্থযোগ, কিছুই আর তাকে আকৃষ্ট করে না। তার মন যেন পরিশ্রান্ত, অবসন্ন। কোলাহল, কলরব থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যাবার তাগিদে জগদীশ অস্থির। জুয়ার আড্ডার পাশ দিয়ে যেতে যেতে সে দেখল, খেলা আবার জমে উঠেছে। সার্কাসের সেই মেয়েটি উন্মত্ত হয়ে বালা খেলতে শুরু করেছে আবার। জুয়াড়ির মুখে পুরনো শিকারী-হাসি ফিরে এসেছে। একটু তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে জগদীশ চলে গেল।

দাঁড়ায় না। কোথাও যেন এতটুকু আশ্রয়, অবকাশ নেই।

ধূ-ধূ প্রান্তর। জনহীন। মধ্যদিনের প্রখর রোদে হাওয়া উত্তপ্ত, পথের ধূলো ঝড়ো হাওয়ার ঘূর্ণীতে চক্রাকারে ঘুরপাক খেতে খেতে উড়ে চলেছে। সেদিকে তাকিয়ে জগদীশ হাসে। তার হাসি পাচ্ছে। মনে হচ্ছে, মানুষগুলোতে আর ধূলোতে কোন পার্থক্য নেই।

একখানা গরুর গাড়ি আগে আগে চলেছে। চাকার তেল নেই

—বিশ্রী ক্যাঁচর ক্যাঁচর শব্দ হচ্ছে। মহাকালের ভাণ্ডারেও কি তেলের অভাব ঘটেছে! জগদীশ বাঁকা হাসি হাসে।···সে একা। নিঃসঙ্গ অবলম্বনশূন্য এই জীবনের কোনোই যেন সার্থকতা নেই। তবে কেন সে চল্‌বে, কি জন্যে এই অর্থহীন অর্থোপার্জনের পিছনে নিজের জীবনের সব তেলটুকু নিঃশেষে অপব্যয় করবে!

পথের পাশে একটা প্রাচীন বট গাছ। অসংখ্য ঝুরি নেমেছে। আর তেমনি এখানে ওখানে ভাঙা শেতলার বিগ্রহ। ছায়াটুকু বেশ মিষ্টি। তরুবালার কথা মনে পড়ে। এমন নিবিড় ছায়া ও বড় ভালোবাসে।

ভ্রূকুঞ্চিত করে জগদীশ, নিজেকে প্রশ্ন করে—ও তোমার কে?

হঠাৎ এরকম একটা সাংঘাতিক প্রশ্নের জবাব খুঁজে পায় না সে। কেউ নয়। কেউ নয়?

তরুবালা বড় ঘরের মেয়ে। তবে কেন এভাবে পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছে? কি চায় ও?

জগদীশ জানে না তরুবালার মনের কথা। একেবারে কিছুই জানে না?

অস্থির পদক্ষেপে সে আবার চলতে শুরু করে। অনেক দূরে চলে যাবে সে। কোনো পিছুটানকেই প্রশ্রয় দেবে না। জগদীশ এই দুনিয়ায় একটি নিঃসঙ্গ, নির্মম পথিক।

অবশেষে এক সরোবরের শান্ত, শীতল জলের দিকে চোখ পড়তে জগদীশ থম্‌কে দাঁড়ালো। আর সে এক-পাও এগোতে পারে না। এইখানে—এখানেই তাকে বসতে হবে। এমনি একটা দুপুর তারা জলের ধারে বসে কাটিয়েছে—পাশাপাশি বসে!

বসে থাকে জলের দিকে নির্নিমেষ দৃষ্টি ফেলে রেখে। কি দেখচে জগদীশ? নিজেকে। নিজের অসংখ্য জোড়াতালি দেওয়া দিনযাপনের ছবি দেখচে সে। না, ভালো লাগে না এ ছবি দেখতে। এতে তার এতটুকু রুচি নেই। আঁস্তাকুড়। হ্যাঁ তরুবালা তাই বলে বটে। তরুবালা? হ্যাঁ, তরুবালার মুখে এ কথা শোভা পায় —এ ছাড়া অন্য কথা তরুবালার মুখে মানাতে পারে না। এমন সুন্দর যার মন, যে মন পঙ্ককে উপেক্ষা ক'রে পদ্মফুলের সৌন্দর্যটুকু নিরীক্ষণ করে, তরুবালা যে সেই মনেরই অধীশ্বরী! জগদীশ তার খামখেয়ালের বশে, তরুবালার মনের উপর কি অকথ্য নির্যাতনই না করেছে। তবু তরুবালা জগদীশকে পরিহার করেনি। ধিক্কার দিয়ে তিরস্কার ক'রে তরুবালা যেন জগদীশের মনের মানুষটাকে খুঁচিয়ে জাগিয়ে তুলতে চেয়েছে···কত কথাই পড়ছে মনে।

শান্ত, স্থির, স্বচ্ছ জলের ওপর একখানি টুলটুলে মুখ, তার ঢল-ঢল চাহনি মেলে দিয়ে জগদীশকে দেখছে। হ্যাঁ, ওই ত তরুবালা। কি বলছে ও? এ তুমি কি করছ? এই জীবনে কি স্বাদ তুমি পাও? শুধু টাকাই চিনলে, আর কিছু চিনতে পারলে না! মানুষের মনে মনের মানুষের ছায়া পড়ে—তোমার মনে পড়ে না?

জগদীশ বিড় বিড় ক'রে বলে আপন মনে পড়ে খুব পড়ে। নইলে আজ আমার এ দশা কেন হবে?

উঠে পড়ল জগদীশ। তর্-তর্ ক'রে জলের কোলে নেমে এসে থামলো। পায়ের শব্দ পেয়ে কতকগুলো ব্যাঙ টুপ-টাপ জলে লাফিয়ে পড়ল। ওপর-ওপর হাল্কা তরঙ্গে শান্ত জল কেঁপে ওঠে। তরুবালার চোখের পল্লবদল এমনিই কাঁপে!

হাতের এ্যাটাচি কেসটা খুলে—একটি একটি ক'রে সব ক'টি টাকা ফেলে দিল।

তরুবালার হাতের ভ্যানিটি ব্যাগটা হাতের মুঠোয় শক্ত করে ধরল জগদীশ। যেন এরই মধ্যে জগদীশের সর্বসত্তা আশ্রয় খুঁজে পেয়েছে। এ্যটাচি কেস্‌টাও ফেলে দিল। যাক, সব কিছু ডুবে তলিয়ে যাক এমনি করে। জগদীশ আর পারছে না নিজেকে বইতে। সবকিছু প্রশ্নের অবসান হোক।

সূয অস্ত গেল। কালও এমনি ক'রেই সূর্য ডুবেছিল। কিন্তু সে সময়ে জগদীশের মনে ত এত শান্তি ছিল না। তরুবালা সঙ্গে ছিল, কিন্তু জগদীশের মন ছিল অন্যত্র—অন্য গ্রহের মানুষ ছিল সে। আর আজ সে নিঃসঙ্গ, তবু যেন মনে হচ্ছে তার সঙ্গে সেই মুখরনয়না মেয়েটি চলেছে।

মুঠোর মধ্যে ভ্যানিটি ব্যাগটা ধরে রয়েছে জগদীশ। সে জানে না এর মধ্যে কি রয়েছে। হয়তো তেমনি সে জানে না, তরুবালার মনের কথা।

আর কিছুই সে ভাবছে না। ভাবতে পারছে না জগদীশ। এখন সে শুধু ফিরে যেতে চায় তরুবালার কাছে। আত্মসমর্পণ করবার জন্য আকুল আগ্রহে তার মন উন্মুখ। ভবঘুরে জগদীশের মনে বিপ্লব মুহূর্ত এসেছে। সে দেখছে ঘরের স্বপ্ন। আর কিছু নয়, এতটুকু ছোট্ট একটি শান্তির নীড় রচনার স্বপ্নে সে বিভোর।

॥ পনের ॥

যাত্রীশালার ঘরে আলো জ্বেলে তরুবালা চিঠি লিখছে।

"শ্রীচরণেষু

বড় মামা, আমার জন্যে ভাববেন না। আমি নিরাপদেই আছি। সম্পত্তির ওপর কোন লোভ নেই আমার। সুতরাং আপনাদের মনোনীত পাত্রের জন্য আপনারা কোনো সৎপাত্রী খোঁজ করতে পারেন। আমার বিবাহের জন্য ব্যস্ত হবার কিছু নেই। অন্তত এখানে যে আমার বিবাহ হবে না, সেটুকু জানিয়ে দিয়ে আমি নিষ্কৃতি নিচ্ছি—"

আর—এমন সময় তরুবালার দরজায় টোক পড়ল। ও সাড়া দিল—কে ?

দরজা ঠেলে শান্তমুখে জগদীশ ঘরে ঢুকল। তরুবালা চিঠিখানা চাপা দিয়ে তাকালো।

ওর মুখের দিকে তাকিয়ে জগদীশ বললে—শুনলুম তুমি এখনো যাওনি ?

—না, তুমি আসবে সেই অপেক্ষায় ছিলুম।

জগদীশের বুকের মধ্যে তোল্‌পাড় শুরু হয়ে যায়। একটু

অপ্রতিভ হয়ে সে বলে—অপেক্ষায় ছিলে! কেমন করে জানলে, আমি ফিরবো?

তরুবালা খিল্‌-খিল্‌ ক'রে হেসে উঠল। তারপর দু-চোখ ঘুরিয়ে বিচিত্র স্বরে বলে—বাঃ, দু-গাছা চুড়ি বেচে দেড়শো টাকা পেয়েছি। আরো দু-গাছা এখনো হাতে রয়েছে—তুমি না এসে যাবে কোথায়? তোমার লোভ যে টেনে আনবে তোমায়।

উত্তেজিত, অপমানিত জগদীশ চাপা গলায় জবাব দেয়—তোমার টাকা নিয়ে পালিয়ে গেছি, এ তুমি কি ক'রে জানলে?

বিচিত্র হাসি হেসে তরুবালা বললে—সে টাকা যে ফেরত দিতে এসেছ তাও যে জানি।

—মানে?

জগদীশের বিব্রত, অপ্রতিভ মুখের পানে তাকিয়ে তরুবালার মন নেচে উঠেছে। ও যেন আরও হাসি দিয়ে জগদীশের বুদ্ধি, ব্যক্তিত্ব সব কিছুকে পরাস্ত করবার জন্য উদ্যত হয়, বলে—বুদ্ধির খেলাতে পুরুষরা মেয়েদের ঠকাতে পারে। কিন্তু ছলাকলা চাতুরীর খেলাতে মেয়েরা তোমাদের চেয়ে কম যায় না, মনে রেখো।

বল্‌তে বল্‌তে তরুবালা নিজের হাতের বাকী দু-গাছা চুড়ি খুলে ফেল্‌ল।

জগদীশ চিত্রার্পিতের মত তরুবালাকে দেখছে, দেখছে ওর প্রতিটি চক্ষের পলক।

টাকার গোছা আর চুড়ি দু-গাছা জগদীশের দিকে এগিয়ে দিয়ে তরুবালা বললে—এই নাও।

বিস্মিত, আহত ক্ষুণ্ণ জগদীশ বললে—তার মানে?

—টাকা ভালোবাসো, এ ত তুমিই বলেছো!

প্রতিবাদের স্বরে ঘনঘন মাথা নেড়ে জগদীশ বললে—না! ভুল। ভুল বলেছি! টাকা আমি ভালোবাসিনে!

তরুবালা একটু চুপ ক'রে কি ভাবে। তারপর নির্লিপ্ত স্বরে বলে—কিন্তু আর ত তোমার ভালোবাসার কিছু নেই।

রুদ্ধশ্বাসে ফিস্‌ফিস্‌ ক'রে জগদীশ যেন নিজের মনেই বলে—এমন কি কিছুই নেই যা টাকার লোভ ভুলিয়ে দেয়।

জগদীশের এ কথায় তরুবালা কলকণ্ঠে হেসে উঠ্‌ল। ওর ওষ্ঠে বিদ্রূপের তীক্ষ্ণ বাণ—শ্মশানবৈরাগ্য! ওতে মেয়েমানুষের মন ভোলে না।

একথার পর জগদীশের মুখ দিয়ে একটি কথাও সরে না। কথায় তার আর রুচি নেই। কোনো কিছুতেই জগদীশের আর মন নেই। যে দুরন্ত পিপাসা নিয়ে সে ফিরে এসেছিল তার চরম ব্যর্থতা যেন জগদীশকে জড় ক'রে দিয়েছে। তরুবালার নিষ্ঠুর বাক্যবাণে সে ব্যথিত হয়েছে, দুঃখ পেয়েছে। এ দুঃখের স্বাদ যেন তার জীবনে এই প্রথম। পরিশ্রান্ত, পরাস্ত জগদীশ চৌকির ওপর শুয়ে পড়ল চোখ বুজে।

তরুবালা সব লক্ষ্য করে। জগদীশকে ফিরে আসতে দেখে ও মনে মনে খুশি হয়েছে। কিন্তু সারাদিনের মানসিক যন্ত্রণার প্রতিক্রিয়ার প্রভাব এড়াবার মতো নৈর্ব্যক্তিকতা ওর মত প্রাণবন্ত মেয়ের থাকতে পারে না—তাই ও জগদীশের দিকে তাকিয়ে একটু প্রতিশোধ নেবার লোভ সামলাতে পারে না। জগদীশকে চোখ বুজে শুয়ে থাকতে দেখে বাঁকা হাসি হেসে ও বললে—তোমার সেই গাঁজা, কোকেনের বাক্সটা কোথায় দিয়ে এলে?

—সে আমি ফেলে দিয়েছি। আর কোনোদিন ছোঁবো না। ব'লে সে তরুবালার মুখের পানে উৎসুক দৃষ্টিতে তাকালো।

তরুবালা ছলনার খেলা শুরু করে—ওমা, তাহলে তোমার চল্‌বে কি করে?

জবাব দিলে না জগদীশ। ঠোঁট কামড়ে চোখ বুজল সে।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে তরুবালা হাসলো—বুঝেছি। এবার তাহলে কেবল মেয়েমানুষ কেনাবেচার কারবারই করবে? চুপ করে আছো, তার মানে সায় দিচ্ছ, তাই না?

জগদীশ যেন বৃশ্চিকদংশনে লাফিয়ে উঠ্‌ল। তার মুখচোখে তীব্র যন্ত্রণার বিকৃতি। সে তরুবালার দিকে ভ্যানিটি ব্যাগটা ছুঁড়ে দিয়ে বললে—যেমন ছিল তেমনি রয়েছে, দেখে নাও!

এবারও তরুবালা হাসে। তবে এ হাসিতে কোন শব্দ ওঠে না।

জগদীশ অধীর ভাবে বললে—তোমার বিশ্বাস পাবার মত কি কোনো পথই আমার নেই?

শান্ত, নিরুত্তাপ কণ্ঠে তরুবালা উত্তর দিল—রাত পোহালে যে ব্যক্তি চলে যাবে, তার বিশ্বাস অবিশ্বাসের দাম তোমার কাছে কতটুকু?

চম্‌কে উঠল জগদীশ। কথা বল্‌তে গিয়ে তার গলা ধ'রে আসে, সে বলে—চলে যাবে? সত্যিই তুমি চলে যাবে, কাল?

হাসতে হাসতে তরুবালা বললে—যে মানুষ আমাকে ফেলে পালাবার জন্যে আকুলিবিকুলি করেছিল, তার মুখে আবার একথা কেন?

জগদীশ ক্লান্ত সুরে বলে—সত্যি কথা তোমায় বলি! জীবনে

আমি কখনো মন দেওয়া নেওয়ার খেলা খেলিনি। কিন্তু আজ বোধহয় তুমি সেই প্রতিশোধ তুলে নিয়ে যাচ্ছ—তাই না তরুবালা?

নিজের নামটা এভাবে শুনে তরুবালা চমকে উঠল।

জগদীশের দিকে একবার তাকিয়ে আস্তে আস্তে দরজা খুলে সে বাইরে বেরিয়ে গেল।

দরজার সামনে চাকরটা বসে রামায়ণ পড়ছে—একঘেয়ে সুরে। একজন লোক এসে ভেতরে ঢুকল।

তরুবালা উঠোনের পাশ দিয়ে যাত্রীশালার বাগানে চলে গেল।

তার পিছনে জগদীশও যন্ত্রচালিতের মত বাগানে গিয়ে ঢুকল। তরুবালা একবার চোখ ফিরিয়ে দেখল—না, ওর কান ঠিকই শুনেছে।

জগদীশ কাছে আসতে তরুবালা বললে—শোনো, আমার নাম ধরে তুমি আর ডেকো না।

—কেন, কোনো ক্ষতি হয়েছে তোমার?

—না, আমার ক্ষতি করা তোমার পক্ষে সম্ভব নয়।

চুপ ক'রে থাকে জগদীশ। তরুবালা মাথা হেঁট ক'রে আস্তে বলে—আমার অনুরোধ, তুমি আমায় ক্ষমা করো।

বিস্মিত জগদীশ সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে।

তরুবালা কুন্ঠিতভাবে ব'লে চলে—হয়তো তোমায় নিয়ে আমি খেলা করেছি। সেজন্য আমি, আমি—লজ্জিত।

গম্ভীর জগদীশ গভীর আন্তরিক সুরে বললে—কিন্তু আমি ত তোমায় নিয়ে খেলা করিনি।

—না, শুধু কেনা-বেচা করতে চেয়েছিলে। তা সে যাক,

আবার ফিরলে কেন? বেশ ত ছুটি নিয়ে চলে গিয়েছিলে! এখন ত বাকী যা ছিল সব ধনদৌলতই তোমার হাতে তুলে দিলুম। আর কেন?

জগদীশ হাসলো। ম্লান বিষণ্ণ বেদনায় সে হাসি কান্নার চেয়েও মর্মস্পর্শী। সে বললে—তোমার কোন টাকায় আমার কোনো দরকার নেই।

—তবে?

—তুমি চলে যাবে তাই একটু কাছে থাকতে এলুম।

—নতুন কি মতলব আবার?

তরুবালা জগদীশের চোখে চোখ রেখে জিজ্ঞাসা করে!

একটু ঘাড় বাঁকিয়ে জগদীশ জবাব দেয়—কিছু না।

—তবে না এলেই পারতে।

—আমি যে হেরে গেছি সেটা না এলে তোমায় বলা হ'ত না।

বক্রকণ্ঠে তরুবালা জবাব দিল—থামো! মহিষাসুরও এমনি করেই ছদ্মবেশে মন ভোলাতে এসেছিল, কিন্তু চণ্ডী তাকে ক্ষমা করেন নি। মনে রেখো!

কথাটা বলে তরুবালা একটু দূরে সরে যায়। জগদীশ চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে। কোন্ নাম-না-জানা ফুলের সুগন্ধে বাতাস সুবাসিত। আকাশের তারার দিকে তাকিয়ে থাকে জগদীশ। তার বুকের মধ্যে কী যেন এক অস্থির আলোড়ন।

তরুবালা কিছুক্ষণ পরে আবার শুরু করল—কাল রাত পর্যন্ত আমি নিরুপায় ছিলুম। কিন্তু এখন এখানে আমার খুঁটিটা শক্ত হয়েছে, একথা ভুলে যেয়ো না!

ঠোঁট কামড়ে জগদীশ নিজেকে সংযত করতে চায়। কিন্তু পারে না। সে দৃঢ়স্বরে জবাব দিল—আমার না হয় মতলব খারাপ। কিন্তু তুমি বড়লোকের মেয়ে হয়ে এই ওঁছা যাত্রীশালাতে কি জন্য এসেছ? কেন, কার জন্যে এখানে সারাদিন উপবাসী অপেক্ষায় রয়েছ?

তরুবালার ঠোঁটের হাসিতে যেন চাবুকের তীক্ষ্ণতা! হাসতে হাসতে ও বললে—বোধহয় তোমারই জন্যে। হয়তো বা এই চাঁদের আলোতে তোমার গলা ধরে কান্নায় উছ্‌লে উঠ্‌বো, তাই জন্যে! টাকা নিয়ে বুঝি পুরোপুরি মন ওঠেনি—এবার আমার সর্বনাশ করতে চাও? তাই না?

কথাগুলো ব'লে তরুবালা আর এক তিলও সেখানে দাঁড়ালো না। হাল্কা দ্রুত পায়ে চলে গেল। জগদীশের দিকে ফিরে চাইলে পাছে দৃষ্টি বিনিময় হয়ে যায়, তাই সেদিকে চাইল না পর্যন্ত। তরুবালা এখন নিজেকেও ভয় করতে শুরু করেছে। ওর আত্ম-বিশ্বাসের পাহাড় কি টলমল করছে?

কিছুক্ষণ একলা বসে থেকে জগদীশ নিজের উপর বিরক্ত হয়।

কোথায় যেন মস্ত বড় একটা সর্বনাশ হয়ে গেছে! তার মনের পরতে পরতে হাজারো ব্যর্থতার সুর কেঁদে ফিরছে।

এক সময় সে উঠে পড়ল, পায়ে পায়ে এগিয়ে এল তরুবালার ঘরের সাম্‌নে। ঠেলা দিতেই দরজাটা খুলে গেল। জগদীশ ঘরে ঢুকতেই তরুবালা উঠে বসল। ওর মুখে যে হাসি ফুটেছে সেটুকু দেখবার মতো মানসিক অবস্থা জগদীশের নেই।

সে আত্মগতভাবে বললে—মাথা তুলতে না পেরে যারা ভাগ্যের

চাকার নীচে পড়ে গেছে, তাদের মাথায় লাথি মারলেও তারা প্রতিবাদ করতে পারে না।

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে জগদীশ আবার ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

তরুবালার ইচ্ছে করে জগদীশকে ডাকতে। কিন্তু কি যেন হ'ল ওর, কে যেন ওর গলা টিপে ধরেছে। তরুবালার গলা দিয়ে কোনো শব্দ বেরুলো না। চিত্রার্পিত তরুবালা নিষ্পলক দৃষ্টিতে শূন্যের দিকে তাকিয়ে থাকে।

পথে নেমে অন্যমনস্ক হ'য়ে জগদীশ চল্‌ছিল। হঠাৎ তার নাম ধরে কে ডাকল—এই যে জগা!

জগদীশ তাকালো—এ্যাঁ!

রঘুনাথ অপ্রসন্ন ভাবে প্রশ্ন করে—তা এই যাত্রীশালাতে কি মতলবে?

- এমনি!

এড়িয়ে যেতে চায় জগদীশ। মানুষের সঙ্গে কথা কইতে তার রুচি নেই।

রঘু সহজে ছাড়তে নারাজ, বলে—বিনি মতলবে তুই কোথাও ঘুরিস নে! কিরে? সঙ্গে মেয়েমানুষ আছে বুঝি?

—যদি থাকেই, ক্ষতি কি?

—তোমার আর ক্ষতি কি—বরং লাভ! সর্বনাশ যার হবার তার ত বিপদ।

জগদীশ উদাসীন ভাবে উত্তর দেয়—ছাখো ভাই মানুষকে সব সময় সন্দেহ করতে নেই।

রঘুনাথের কথার অপেক্ষায় জগদীশ দাঁড়ায় না। সে চলে গেল। তাকে এগিয়ে যেতে দেখে রঘুনাথ যাত্রীশালায় ঢুকে পড়ল। সামনেই ছকুলালের সঙ্গে দেখা হ'ল তার। ছকুলালকে সে প্রশ্ন করে—এই শোন্, ওই যে বাবু এখুনি বেরিয়ে গেল, তার সঙ্গে কোনো মেয়েছেলে আছে নাকি রে?

ছকুলাল বললে—আজ্ঞে ওঁর গিন্নী রয়েছেন। আহা সাক্ষাৎ লক্ষ্মী ঠাকরুণ।

রঘুনাথ ঠোঁট উল্টে আপন মনে বিড়বিড় করে—গিন্নী! সোনার পাথরের বাটি? যা ভেবেছি তাই—তাহলে!

ছকুলাল বলে—কিছু বলছেন বাবু?

—না, কিছু না! যা—

রঘুনাথ খুশিমনে যাত্রীশালা থেকে বেরিয়ে পড়ে। এখনই একটা ব্যবস্থা করা দরকার। নইলে জগা যা ওস্তাদ, টের পেলেই মেয়েটাকে কোথায় সরিয়ে ফেলবে তার ঠিক নেই। ব্যাটাকে রঘু এবার ফাঁদ দেখিয়ে ছাড়বে। সেও পোড়খাওয়া শাহেন্‌শা ছেলে।

॥ ষোল ॥

বাজারের দোকানপাটে বিক্রিবাটায় ভাঁটা পড়ে এসেছে। রাত মন্দ হয় নি। কালভৈরবের মন্দিরে যারা নানা-বাসনার ফিরিস্তি নিয়ে বাবার পায়ে পূজো দিতে এসেছিল, তাদের উৎসাহের প্রথম জোয়ার কেটে গেছে।

চায়ের রেস্তোরাঁতে বিষণ্ন জগদীশ এসে ঢুকতেই একটা সাড়া পড়ে গেল। অল্পবয়সী ছেলেছোক্‌রাদের চোখে সে এক মহা বিস্ময়কর ব্যক্তি। রূপের জৌলুসে জগদীশ সকলকে টেক্কা দেয়, তার উপর দুঃসাহস আর দুর্ভাষণেও সে মুখ্য ব্যক্তি। সে কাউকে পরোয়া করে না। অনেকের বিশ্বাস কোকেন-গাঁজার চোরা কারবারের দৌলতে জগদীশের সঙ্গে বিস্তর 'রইস্ আমীর-ওম্‌রা'র সঙ্গে আঁতাত আছে। ইচ্ছে করলেই জগদীশ ছায়াচিত্রে 'হিরো'র ভূমিকায় অভিনয় করতে পারে—যাতে প্রচুর খ্যাতি আর ততোধিক পয়সা! তবু এই অবহেলিত, দরিদ্র, কানাগলির মানুষের সঙ্গে ওঠাবসা করে জগদীশ, তার প্রধান কারণ—সে বড়লোকদের ঘৃণা করে, আর মেয়েছেলের নামে নাকসিঁটকে থুথু ফ্যালে!

রেস্তোরাঁর মালিক হেসে অভিবাদন করল—আসুন আসুন বড়বাবু! ব্যাপার কি দেখাই নেই যে!

ছোক্‌রা কারিগর গলা বাড়িয়ে বললে—এই যে ওস্তাদজী, ফাস্‌ ক্লাস্‌ কাটলিস্‌ বানিয়েছি, চলুক একখান!

বিরস ভাবে জগদীশ চোখ তুলে তাকালো।

এ চাহনী জগদীশের স্বাভাবিক দৃষ্টি নয়। কারিগর হাতের কাজ ফেলে রেখে বেরিয়ে এসে প্রশ্ন করে—কি হয়েছে ওস্তাদ! কারবারে কোনো ক্ষেতি হলো নাকি?

গম্ভীর ভাবে জগদীশ বললে—হ্যাঁ!

দোকানী লক্ষ্য করছিল জগদীশের হাবভাব। সে টাকার হিসেব করতে করতেই বললে—যে তোমাকে ঠকায় তার ত আখেরে সুবিধে হবে না বড়বাবু! একগুণ নিয়ে থাকলে তাকে দশগুণ ওগ্‌রাতে হবে। হেঁ-হেঁ—

জবাব দিল না জগদীশ।

নিশ্চিন্দিপুরের প্যাস্তা ঘটক কোথা থেকে এসে জুটল—সত্যি, ওস্তাদ! আমার যে মাল আবানে পেট ফুলে যাবার দাখিল। ছাড়ো দু-চার খোরাক, নইলে মারা যাবো!

দাঁত খিঁচিয়ে জগদীশ জবাব দিল—ওসব কারবার আমার নেই, যাও-যাও—

প্যাস্তা ঘটক কাঁচুমাচু হয়ে বলে—বটে, পয়সা দিতে পারছি নি ব'লে অমন করছ!

রেস্তোরাঁর মালিক ভ্রূকুঞ্চিত করে। প্যাস্তা ঘটক তার দিকে চাইতেই দোকনী বললে—দ্যাখো ঘটক মশাই, গাঁজাগুলির বেচাকেনা

এ দোকানে বসে চল্‌বে না। পুলিশের নজর পড়েছে। অন্তত্তরে ওসব কথা কয়ো!

প্যান্তা ঘটক চটে গিয়ে বললে— অ, তেল হয়েছে ভারি। আরে ম্যালাপাব্বন ত এই দু-দিন, তারপর এই—কথায় বলে নটে-খটে আড়াইয়ে কিন্তু সজ্‌নে বারোমাস! তা আমরা সেই সজ্‌নে। দেখে নেবো, তখন তেল কোথায় থাকে।

উত্যক্ত জগদীশ ধমকে উঠল প্যান্তাকে—যাও, এখানে লোক জড়ো করতে হবে না। যতো গুলিখোরের আড্ডা এই ইয়েতে।

প্যান্তা আশা করেছিল জগদীশ তার পক্ষ নিয়ে তেড়ে লড়াই করবে। কিন্তু এ যে বিপরীত! চুপ্‌সে গেল প্যান্তা ঘটক। সত্যি কথা বল্‌তে কি, জগদীশের ভরসাতেই সে দোকানীকে এতগুলো কথা শুনিয়ে বসেছে। অবশ্য জগদীশের ভাববৈকল্য দোকানীকেও কম বিস্মিত করে নি।

ব্যাজার মুখে প্যান্তা সরে পড়ল। দোকানী বললে—বড়বাবু চা।

—না, থাক্‌।

—সে কি বড়বাবু, কাজকারবার বুঝি খারাপ?

—হাঁ, তা অনেকটা।

কথা কইতে জগদীশের ইচ্ছে করে না।

দোকানী বিজ্ঞভাবে বলে—স্বাধীনতা পাবার পর থেকে লোকে আর তেমন নেশাভাঙ করছে না! ওটা এখন চা-কফিতেই চুকিয়ে ফ্যালে। দেখুন না, আমার দোকানের বিক্কিরি বেড়েই চলেছে—আরও দু-টো দোকান হলো, সেগুলোও মন্দ যাচ্ছে না।

এককোণে জগদীশ চুপ করে বসেছিল। চেনাশুনো অনেকেই

সেটা লক্ষ্য করে। কিন্তু তার আত্মসমাহিত মুখের দিকে তাকিয়ে ঘাঁটাতে সাহস করে না কেউ। জগদীশকে এরা সবাই ভালোবাসে আবার একটু সমীহ ক'রেও চলে। এই তরুণ যুবকের মধ্যে কোথায় যেন এক অসাধারণ ব্যক্তিত্বের বাস রয়েছে।

এক সময়ে বাজারের দোকানে দোকানে ঝাঁপ পড়ে গেল। রেস্তোরাঁর মালিক একটু কুণ্ঠিত ভাবেই জগদীশকে স্মরণ করিয়ে দিল —এবার দোকান বন্ধ করব বড়বাবু!

অন্যমনস্ক ভাবেই জগদীশ উঠে দাঁড়ালো—ও, আচ্ছা চলি ভাই।

পথে নেমে জগদীশ নিজের মনে প্রশ্ন করে, কোথায় যাবে? অসংখ্য গুপ্তগৃহের চোরা দরজা তাকে হাতছানি দিচ্ছে। সে মুখ-বাঁকিয়ে সেদিক থেকে ঘুরে দাঁড়ায়। না, ওখানে আর ফিরে যাবে না জগদীশ। কেন? তরুবালা যা পছন্দ করে না, জগদীশ তা করতে পারবে না। না, না, না। কিন্তু তরুবালা তার কে? কে! তাই ত? তাকে তরুবালা তাড়িয়ে দিয়েছে। তরুবালা কি জগদীশকে পছন্দ করে না? না, না, সে কথা জগদীশ বিশ্বাস করতে পারবে না। এত কথা, এত ইসারা ইঙ্গিতে জগদীশের বিশ্বাসের পথ আগলে রয়েছে যে, তরুবালার মুখের কথাটা মেনে নেবে কি করে সে! নিশ্চয় তরুবালা তার ওপর অভিমান ক'রেই কতকগুলো কড়া কড়া কথা শুনিয়েছে। তরুবালার মনের কথা জানতে পেরেছে জগদীশ। হ্যাঁ, ভালো করেই জেনেছে।

চল্‌তে চল্‌তে নির্জন পথে নিজের পদধ্বনি শুনে জগদীশ চম্‌কে ওঠে।

একী করছে সে? ছেলেমানুষের ওপর রাগ করে এইভাবে ওর

মনে কষ্ট দিছে! ছি, ছি। না তার চেয়ে ফিরে যাবে। একা-একা তরুবালা ঘুমোতে পারবে না। ওর যা ভয়! মুখে যা-ই বলুক, জগদীশ এই দু-দিনে বুঝেছে, তরুবালার মনটি এখনও কাঁচা।

সরাসরি জগদীশ ঢুকে পড়ল ঘরে। আলোটা টিম্-টিম্ করছে। তরুবালা শুয়ে রয়েছে। ঘুমিয়ে পড়েছে হয়তো। জগদীশ কোনো কথা না ব'লে চৌকির একপাশে শুয়ে পড়ল! সে বড় পরিশ্রান্ত। নিজের সঙ্গে বোঝাপড়ার প্রয়োজন জীবনে সে এই প্রথম অনুভব করেছে। আবার যেন নতুন ছন্দে শুরু করতে চলেছে জীবন। অবহেলিত, অজ্ঞাত, অন্ধকার ছন্নছাড়া দিনযাপনের প্রতি কী এক বিদ্বেষ তাকে পেয়ে বসেছে। তাই সে ফিরে এসেছে তরুবালার কাছে। কিন্তু কাছে এসেও সঙ্কোচের প্রাচীর ডিঙোতে পারবে না, একথা জগদীশ একটু আগেও টের পায় নি। তরুবালার এত কাছাকাছি থেকেও সে যেন অনেক দূরের মানুষ। হাত বাড়ালেই তরুবালার দেহের নাগাল পেতে পারে, কিন্তু মনের—? প্রশ্নটা কিছুক্ষণ চোখ বুজে শুয়ে শুয়ে ভাবলো, তারপর জগদীশ হাই তুলল—।

তরুবালা ঘুমোয় নি। জগদীশ হাই তুলতেই তরুবালা উঠে বসল।

চম্‌কে জগদীশ প্রশ্ন করে—ও কি, তুমি বুঝি ঘুমোও নি এখনো?

হাসতে হাসতে তরুবালা হাল্কা স্বরে বলে—কাল তোমায় ছেড়ে চলে যাবো, তাই বোধ হয় ঘুম আসতে চাইচে না।

জগদীশ ওর দিকে মিনতি করুণ চোখে চেয়ে, ক্ষুন্ন কণ্ঠে বললে—কথার আঘাত কখন কোথায় বাজে, সে তুমি বোঝো না!

—বাজে নাকি? এসব বাজে কথা তোমার!

—না, বাজে কিছুই আর বল্‌ব না। একটা কথা শুন্‌বে?

—তোমার কথা আমার সব জানা হয়ে গেছে!

আশাদীপ্ত চোখে জগদীশ তাকালো—সত্যি বল্‌ছ? কি কথা বল তো!

—ওই চাকরটার কাছে আমায় মোটাটাকায় বেচে দেবে, তাই অনুমতি চাও, তাই না?

দীর্ঘশ্বাস পড়ল, জগদীশ মাথা নিচু ক'রে বললে—আমার পরিচয় তুমি যতটুকু জেনেছ তা সবটাই নোংরা, ময়লা। তাই যা-তা অপমান করলেও সইতে হবে আমাকে। কিন্তু ওটাই ত সব নয়! ভাগ্যের কারসাজি আমাকে উঠতে দিল না ব'লে কি তুমি আরও নীচে নামিয়ে দিয়ে চলে যাবে, তরুবালা? যাবার বেলাও তুটো ভালো কথা তোমার মুখ থেকে বেরুবে না?

—ধরো, যদি আমি এখন না যাই? যদি কিছুদিন থাকি এখানে?

তরুবালার কণ্ঠস্বর আগের মতো চপলতায় মুখর নয়।

জগদীশ ওর মুখের দিকে তাকিয়ে সোজা হয়ে উঠে বসল—যাবে না? ঠিক বল্‌ছ, তুমি যাবে না? তবে আমি যা জেনেছি তা সত্যি?

—কি জেনেছো? কি সত্যি?

যে কথাটা এত সহজ, এত স্পষ্ট, সেটা যেন জগদীশ মুখ ফুটে বল্‌তে ভরসা পায় না। তরুবালার ওপর এইজন্যই তার এত রাগ।

তরুবালা যেন ধরা দিতে গিয়েও সরে যায়। নইলে, ওর চোখে মুখে হাবে ভাবে এই উচ্ছ্বাস হাসির অর্থ কি! জগদীশ বলে—এই জেনেছি যে তুমি হারিয়ে গেছ? রাঙাদি তোমায় খুঁজছে!

মুখ টিপে, চোখ ঘুরিয়ে তরুবালা বললে—বটে, আমাকে কি দেখে সেইরকম বোকা ন্যাকা মনে হয়! হারিয়ে যাবো এমন গাঁইয়া! বাঃ তোমার বুদ্ধির তারিফ করছি! এই বুদ্ধি নিয়ে যাদের ঠকাও তারা কি রকম মানুষ?

জগদীশ শান্তকণ্ঠে এবার বলে,—তুমি হারাবার মত না হতে পারো, তবে পালাবার মতো বটে!

গম্ভীর ভাবে তরুবালা মাথা নাড়ে—হারানো, পালানো ছাড়াও অন্য পথ রয়েছে! যে পথে হাঁটতে গেলে সাহস দরকার হয়, আমি সেই পথের মানুষ। নিজের ইচ্ছেতে চলে এসেছি। পায়ের ওপর আমার নির্ভর করবার শক্তি রয়েছে। কেবল রাঙাদির চোখে একটু ধুলো দিয়েছি, বুড়ি বড্ড পিছনে লেগেছিল। বুঝলে, আমি আর ফিরবো না।

—একা তুমি। এত বড় ঝুঁকি নিতে ভয় করছে না?

—ভয়! সমস্ত পথে কুটিল কাপুরুষের ভিড় দেখতে দেখতে এসেছি। ভয় আর পাইনে!

জগদীশ একটু কাছে সরে বসতেই তরুবালা মুখ ঘুরিয়ে হাসলো —আঃ, অমনি লাফিয়ে উঠলে? চুপ করে বসো!

শান্ত দৃষ্টিতে জগদীশ তরুবালার দিকে তাকায়।

তরুবালা বলে—তোমার মতো মানুষ আমাকে কোন্ চোখে দেখবে বলো? তুমি সারা জীবন কেবল মেয়েছেলে নিয়ে জুয়া খেলো!

—না, সারা জীবন নয়। তবে বছর দশেক হবে। কিন্তু শুধু শুধু বাড়ি ছেড়ে কেন এলে বলো তো?

তরুবালা খোলা জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে রয়েছে। চাঁদের আলোয় সুপ্তির জড়তা। কোন্ পেটা-ঘড়িতে ঢং ঢং করে দুটো বাজছে।

বাইয়ের দিকে তাকিয়ে তরুবালা বলে—শুধু-শুধু! তোমরা কি মনে করো জানিনে, তবে আমার মধ্যে নিজেকে জানার একটা চেষ্টা সর্বদাই অস্থির করে রাখে আমাকে। মনে হয়, বুঝি-বা ছকের বাইরে, নিজের সুখের গণ্ডি পেরিয়ে যে অসংখ্য মানুষের চলাফেরা, মরাবাঁচা—সেটাই সত্যিকার পৃথিবী। এই পৃথিবীতে এলাম অথচ তার কিছুই জানা-বোঝা হ'ল না! কেবলই পরের হাতের পুতুল হয়ে থাকবো—এ আমার অসহ্য। নিজের দাম আমার অনেক বেশি। সেটা প্রমাণ করবো কঠিন বাস্তবের সামনে।

জগদীশ ওর পাশ ফেরানো মুখের খানিকটা অংশ দেখতে পাচ্ছে। ওর কথাগুলো স্বপ্নরাজ্যের হাতছানির মতো ইসারা দিয়ে তাকে ডাকছে। বললে—কিন্তু মেয়েমানুষের বিপদের কথাটা কি ভাবো নি?

—হুঁ! তা ভেবেছি। কিন্তু তোমার মতো সুকুমার সুন্দর কান্তির সঙ্গে যে এতখানি নোংরা জড়ানো থাকতে পারে সেটা মনে হয়নি। সেদিক দিয়ে তোমার কাছে আমি ঋণী—তুমি আমাকে যে নরককুণ্ড দেখিয়েছ সেজন্য ধন্যবাদ।

জগদীশ মুখ তুলে তরুবালাকে দেখে আবার মাথা নত করল—আমি নোংরা, আমি নরককুণ্ড। সত্যি বলেছ। কিন্তু এর চেয়ে

ঢের বেশি নোংরামির বাস তোমার খুব কাছাকাছি, সেখানে আরো বেশি আঁধার, সেটা তুমি ছাখো নি তরুবালা!

তরুবালা জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে জগদীশের দিকে তাকিয়ে থাকে।

আর জগদীশ যেন নিজের মনের মধ্যে ডুব দিয়ে আপন ধ্যানেই কথা ক'য়ে চলেছে—এদিকে অনেক দুঃখ, অনেক কঠিন এ পথ তরুবালা! বাঁচার জন্যে মানুষ কোথায় নিজেকে নামিয়ে ফেল্‌তে পারে সেকথা তুমি ত জানো না! পেটের দায়ে ইজ্জৎ বিক্রি করা, লালসাকে পুষবার জন্যে পেটের সন্তানকে বিষ খাইয়ে মেরে ফ্যালা, আর ···

রুদ্ধশ্বাসে তরুবালা জগদীশের হাত চেপে ধরল, ভয়ে ওর মুখখানা ফ্যাকাসে বিবর্ণ—আর ব'লো না, আমার ভয় করছে!

—তোমার ভয় করছে! আমার কিন্তু কান্না পায়। মা-বাপ যখন পয়সার লোভে ছেলেমেয়েকে জঘন্য জীবনের দিকে ঠেলে দেয়, স্বামী তার নেশার কড়ি পাবার জন্য স্ত্রীর সতীত্ব বিক্রি ক'রে—তখন আমার কান্না পায়!

—তবে, এসব জেনেও তুমি এ নোংরাতে নামলে কেন?

—কেন এলুম? থাক্—সে আর না-ই শুনলে।

কথা বল্‌তে বল্‌তে জগদীশ যেন অন্য মানুষ হয়ে গেছে। তার সর্বসত্তায় তীব্র শিহরণ।

তরুবালা আগ্রহে উদগ্রীব, ও বলে—না থাকবে না। তুমি বলো—

আর্তকণ্ঠে জগদীশ বলে—সে তুমি সহ্য করতে পারবে না।

—খুব পারবো। তুমি যদি না বলো, সেটাই দুঃসহ হবে।

জগদীশ আন্তরিকতায় আর্দ্র হয়ে পড়েছে, তার কণ্ঠস্বরে আশ্চর্য গভীর আবেগ—মা! বুঝলে, আমার মাকে বাবা খুব মারতেন। দূরে দাঁড়িয়ে আমি দেখতুম, আর কাঁদতুম। কিছুই করতে পারতুম না। শুধু চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে আমি চোখের জল মুছতুম। তখন কিছুই বোঝবার মতো বুদ্ধি হয়নি। এমনই এক দিনে বাবা দিলেন মাকে গলা ধাক্কা দিয়ে বাড়ির বার ক'রে। কি সে লজ্জা! চোখ মুছে মা আমার হাত ধরে এসে দাঁড়ালেন মামাবাড়িতে।

তরুবালার দু'চোখ বাষ্পাচ্ছন্ন হয়ে আসে। জগদীশ আপন মনে বলে চলেছে নিজের জীবনের কথা। অন্যদিকে তাকাবার ফুরসৎ নেই তার। কতকাল পরে সে আবার একবার নিজের অতীত জীবনকে দেখবার সুযোগ পেয়েছে—হ্যাঁ, সুযোগই ত, এমনিতে সে নিজেকে বাইরের কাজ দিয়ে ভুলিয়ে রাখে, নিজেকে ভুলেই গিয়েছিল একরকম!

জগদীশ বলছে—মামা একবেলা দু'মুঠো ভাত পর্যন্ত দিল না। আমাদের নাকি সেখানে ঠাঁই নেই। মা নাকি স্বামীর ঘর ছেড়ে চলে এসে অন্যায় করেছে। হিন্দুর মেয়ে বিয়ের পর স্বামীর পায়ের তলায় পড়ে থাকবে, শাস্ত্র তাই বল্‌ছে। মামা গোঁড়া হিন্দু।...আমার মুখ চেয়ে মা শেষে দাসীবৃত্তি নিয়েছিলেন। কোন্ এক অবস্থাপন্ন গেরস্থবাড়িতে গোয়ালঘরের কাজ। আমাদের জায়গা হ'ল গোয়াল ঘরে। মা তাতেই খুশি। সারাদিনের হাড়-ভাঙা খাটুনী, শীতের রাতে গায়ে কাপড় জোটে না, বর্ষার রাত

ফুটো চালার তলায় ঠায় বসে বসে বৃষ্টিতে ভিজে কাটে—তবু মায়ের মন খুশিতে ভরপুর। তাঁর অনেক আশা, আমি মানুষ হবো লেখাপড়া শিখে !...

এই পর্যন্ত বলে জগদীশ হেসে উঠ্‌ল, বিকারগ্রস্তের মতো এক নাগাড়ে সে হেসেই চলেছে।

কিছুক্ষণ তার দিকে তাকিয়ে থেকে তরুবালা অধীরভাবে প্রশ্ন ক'রে—অমন করে হাসচো কেন ?

—এ্যাঁ !

চম্‌কে উঠ্‌ল জগদীশ বাধা পেয়ে। বললে—হাসছি ? না, না, হাসিনি ত। আমার সব হাসি হাসি নয়। বুড়ো বয়সে ত কাঁদতে পারি নে, তাই হাসছি। মায়ের আশাকে কেমন মর্যাদা দিলাম, সেই কথা ভাবছিলাম।

তরুবালা বললে—তারপর কি হ'ল বলো !

—তারপর যা হয়েছে তা ত দেখচ স্বচক্ষে—এই ত মায়ের আশার ফল। যাক্‌, যা বল্‌ছিলুম। একদিন পালালুম।

—পালালে কেন ?

—তোমার মত জ্ঞানের তৃষ্ণায় নয়, বিতৃষ্ণায়।

তরুবালা ছেলেমানুষের মতো হাত নেড়ে বলে—হেঁয়ালি ক'র না, বলো।

—আর লুকিয়ে কি হবে। বল্‌তে বসে লুকোচুরি করব না তোমার কাছে। অন্তত দুনিয়াতে একজন থাকুক আমি ছাড়া যে আমাকে জানে। হ্যাঁ, মায়ের সামান্য কিছু টাকা জমেছিল। সে টাকা নেহাৎই তুচ্ছ। কিন্তু মায়ের সারা জীবনের সঞ্চয়।

টাকা চুরি করে আমি মায়ের একমাত্র সন্তান মায়ের বুক ভেঙে দিয়ে দুনিয়ার দরবারে রওনা হলুম।

তরুবালা বাধা দিল—কেন এমন কাজ করলে? তুমি ত মাকে ভালোবাসতে—

—হ্যাঁ, মাকে ভালোবাসতুম তাই ত আমাকে চলে যেতে হ'ল! এ ছাড়া অন্য পথ ছিল না যে। যা ঘটেছিল তারপর আমার আর সে গাঁয়ে থাকা অসম্ভব। একটি মেয়ে আমার জীবনে চরম দুর্গতি এনে দিল।

—মেয়ে?

—হ্যাঁ, গাঁয়ের মেয়ে। বয়স আমার অল্প, কিন্তু স্নেহ অল্প ছিল না। তাকে আমি ভালোবেসেছিলুম—জীবনের সবটুকু প্রীতি তাকে নিংড়ে উজাড় করে দিয়ে বসেছিলুম! তার বদলে সে আমায় যা দিল তাও বড় কম নয়—তবে সেটা বিপরীত দিক দিয়ে দেখতে হয়। কি করল সে জানো? সে আমার মায়ের নামে কলঙ্ক মাখিয়ে দিল। আমাকে বললে, কুলটার ছেলে। এমনি করে সে আমার ভালোবাসার অপমান করলে, আমার জীবনকে যেন পা দিয়ে মাড়িয়ে দিল। এরপর আমি যেন কি হয়ে গেলুম। মায়ের সামনে মুখ দেখাতে পারি না! তাই মায়ের কষ্ট জেনেও না পালিয়ে পারলুম না।...শহরে এসে চমৎকার আশ্রয়, বস্তীতে ঠাঁই মিলে গেল! বস্তীর বাদশা হয়ে বসলুম। সেদিক দিয়ে আমার আর যোগ্যতার অভাব কি? বাপ মাতাল, মা কুলটা, আমি চোর! ব্যস, চড়্‌চড়্‌ ক'রে নীচে নামতে লাগলুম। বিস্তর দোস্ত-সাকরেদ জুটে গেল।

বাইরে যেন পায়ের শব্দ শোনা যায়। জগদীশ একবার উঠে, জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখল। কান খাড়া ক'রে তার মনে হয়, কারা যেন ভেতরের বারান্দায় ফিস্‌ফিস্‌ করে কথা বল্‌ছে। তরুবালার ভ্রূ কুঞ্চিত হয়ে ওঠে, বলে—কে ?

কি মনে ক'রে তরুবালা বারান্দায় বেরিয়ে গেল। কাউকে দেখতে পেল না। কিন্তু দু-তিনটি ছায়া আড়ালে সরে গেল। নিশ্চিন্ত মনে ও বললে—না, কেউ না !

ফিরে এসে তরুবালা চৌকির ওপর বসতে জগদীশ বললে—বেশ কাটছিল ! কিন্তু—

—কিন্তু নয়, তুমি এর বাইরে বেরিয়ে এসো !

বিস্মিত জগদীশ প্রশ্ন করে—বাইরে ? কোথায় ?

তরুবালা যেন এ কথায় উৎসাহিত হয়ে উঠে, ওর চোখেমুখে ঔৎসুক্যের দ্যুতি খেলে যায়—যেখানে খোলা হাওয়া, অবারিত মুক্তি, নিষ্পাপ জীবন, আকাশে বাতাসে পরমায়ুর আনন্দ, সেই সুন্দর সুস্থ জগতে তোমার পথ নেই ?

ভোর হয়ে এসেছে। আকাশে আলোর আভাস ফুটে উঠ্‌ছে যেন।

জগদীশ চুপ করে থেকে আস্তে আস্তে বলে—আমার কথা থাক্‌। তোমাকে বলতে এসেছিলুম, তোমার এ পথ নয়, তুমি ফিরে যাও। এখানে আঁধার, চারদিকে চোরা বালি—এ তুমি সইতে পারবে না।

তরুবালা প্রবল বেগে মাথা নাড়ে, প্রতিবাদের কণ্ঠে বলে—কে বলেছে সইতে পারবো না ?

জগদীশ আরও জোরে বলে—না না, আমি জানি তুমি পারবে

না। পদে পদে কাঁটা, পথে পথে কাদা—এ তোমার জন্ম নয় তরুবালা, তোমাকে ফিরতে হবে।

তরুবালা আর্তস্বরে বলে—আর তুমি ?

—আমি ?

জগদীশ চুপ করে থাকে। তরুবালা উদগ্রীব দৃষ্টি মেলে চেয়ে থাকে। বলে—বলো, উত্তর দাও— ?

—আমি! বিশ্বাস করো, ওদের মধ্যেই আমি! ওদের সুখদুঃখে মেলানো, পাপে পুণ্যে জড়ানো। আমি ওদের ব্যথা বেদনার সাক্ষী! দীর্ঘদিনের জীবনে আমি ওদের মধ্যে নিজেকে মিশিয়ে ফেলেছি। হাজার চেষ্টা করলেও আমি ছিঁড়ে ফেল্‌তে পারবো না, আলাদা করতে পারবো না—নিজেকে কি করে বদলাবো, তরুবালা! সে হয় না। আমি যা, আমি তা-ই!

কথা বল্‌তে বল্‌তে জগদীশের কণ্ঠ যেন রুদ্ধ হয়ে আসে। সে নিজের মনেই ঘনঘন মাথা নেড়ে সজোরে বলে উঠল—না, না, না! ওদের ছেড়ে যেতে পারবো না। ও কথা আমায় বলো না।

তরুবালা জগদীশের গা-ঘেঁষে বসে। চৌকির ওপর থেকে চুড়ি দু'গাছা তুলে নিয়ে জগদীশ তরুবালার হাতে পরিয়ে দেয়। চোখ তার অশ্রু ছলছল। সে নিজেকে সাম্‌লে নিয়ে বলে—পুরুষের হাত শূন্য কারণ সে যুদ্ধ করে। কিন্তু চুড়িপরা হাত ভালোবাসার বাঁধনে ধরা পড়ে।

বাইরে কি একটা কলরব উঠেছে। উৎকর্ণ জগদীশ একবার ফিরে তাকালো দরজার দিকে। তরুবালার মুগ্ধ-সম্মোহিত চাহনী জগদীশকে একনিষ্ঠভাবে অনুসরণ করে।

জগদীশ বললে—আমি যাই ?

—না, এখন না, পরে যেয়ো।

হাসিমাখা মুখে জগদীশ বলে—আশ্চর্য তুমি! তোমার মধ্যে আমি নিজেকে খুঁজে পেয়েছি, একথা জীবনে ভুলব না!

কোলাহল ক্রমশ বেড়ে উঠছে। জগদীশ বললে—ব্যাপার কি ? দাঁড়াও দেখি।

অপস্য়মান জগদীশের পায়ে পায়ে তরুবালার চোখের দৃষ্টি চল্‌ল। এক সময়ে জগদীশ ওর চোখের অন্তরালে চলে যায়। তরুবালা বললে—তাড়াতাড়ি ফিরো!

॥ সতেরো ॥

যাত্রীশালার দরজায় দু'খানা মোটর দাঁড়িয়েছে। প্রথম গাড়ি থেকে দুজন সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক এবং একজন মহিলা নামলেন। পিছনের গাড়ি থেকে নামলো রাঙাদি, রঘুনাথ এবং জন দুই দারোয়ান। এই সাত সকালে এতগুলি মানুষ এবং দামী মোটর গাড়ি জমতে দেখে কৌতূহলী জনতা ভিড় ক'রে এলো। এর সঙ্গে রয়েছে আবার যাত্রীশালার বাসিন্দারা। সবারই চোখে মুখে তামাশা দেখার লোভ।

তরুবালার পিতা হরগোবিন্দ চৌধুরী গাড়ি থেকে নেমে চারিদিকে চোখ বুলিয়ে ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে, তাঁর বড় শালা ফটিক রায়ের দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললেন—হাঁ হে ফটিক, তুমি ঠিক জানো, এই রকম অদ্ভুত জায়গায় ও রয়েছে?

ফটিক রায় তাকালেন রাঙাদির দিকে, রাঙাদি সঙ্গে সঙ্গে রঘুনাথের দিকে তাকিয়ে বললেন—আমি কি চোখে দেখেছি! এই ছেলেই ত সব খোঁজখবর দিলে!

তরুবালার মা সুরবালা বিজ্ঞভাবে ঘাড় নাড়লেন—ও মেয়ে সব পারে। বাপের আদরে আদরে ওর মাথায় কি পদার্থ আছে? একবার

জিদ ধরলো ত আর রক্ষে নেই—মাথা গেল খারাপ হয়ে। মান মর্যাদা কিছুর জন্যে কিছু আটকায় না—

সুরবালার হাতে খুব দামী শাড়ি, জামা এবং অলঙ্কার।

রঘুনাথ বেশ জোর দিয়ে বলে—ও আর দেখতে হবে না। আমি ভালো ক'রে খবর না নিয়ে আপনাদের এখানে টেনে আনি নি।

ফটিক রায় বললেন—আর এখানে দাঁড়িয়ে কি লাভ, চলো ভেতরে যাই।

ছকুলাল এতগুলি লোককে একসঙ্গে ঢুকতে দেখে মনে মনে খুশি হয়ে ওঠে, বকশিশের বহর আন্দাজ ক'রে অতি দীর্ঘ একখানা সেলাম ঠুকে বলে—খুব সুন্দর ঘর আছে বাবু!

রঘুনাথ ধমক দিয়ে বলে—থাম ব্যাটা! তোর এই আঁস্তাকুড়ে বাবুদের থাকতে ভারি গরজ পড়েছে! চল্, তোর সেই বাবুর ঘর দেখিয়ে দিবি চ—

ছকুলাল পাকা লোক। হাওয়ার আগে গন্ধ পায় সে। একগাল হেসে বলে—এই যে আসুন, সামনেই বাবুর ঘর!

ঘর দেখিয়ে দিয়ে ছকুলাল সরে পড়ল।

প্রথমেই রাঙাদি হুড়মুড় ক'রে দোর ঠেলে ঘরে ঢুকলেন। তাঁর মুখে খই ফুট্‌ছে—গোপাল, গোপাল! মেয়েকে না পেলে আমি কি আর এ পোড়ার মুখ তোমাদের দেখাতে পারতুম? রঘু আমার মান রক্ষে করেছে। গোপাল, গোপাল!

তরুবালা চম্‌কে উঠেছে রাঙাদির গলা পেয়ে। চকিতে চারিদিকে অসহায় ব্যাকুল দৃষ্টি নিক্ষেপ করে তরুবালা।

রাঙাদির পিছনে-পিছনে সুরবালাকে ঢুকতে দেখে তরুবালা অস্ফুটস্বরে বলে—মা! তুমি?

ওর মুখের কথা শেষ হবার আগেই সুরবালা মেয়ের পাশে এসে বসলেন। সস্নেহে মেয়ের পিঠে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বললেন—আমি কিন্তু কিছুই বুঝতে পারিনি রে! তুই হারিয়ে গেলি কেমন ক'রে? তোর মতো মেয়ে যে অমনি অমনি হারায় না, সে ত বুঝলুম বড়দার কাছে লেখা তোর চিঠি থেকে।

হরগোবিন্দ দরজার বাইরে থেকে মুখ বাড়িয়ে বললেন—মেয়েটা সত্যি পাগলী! নইলে এইভাবে কেউ প্রতিবাদ জানায় নাকি? হ্যাঁ মা, তুই মুখ ফুটে আমাকে বল্লেই ত ল্যাঠা চুকে যেত! তা নয়, মশা মারতে কামান দাগা!

হঠাৎ কোথা দিয়ে কি ঘটে গেল, তরুবালা কিছুতেই বুঝে উঠতে পারে না। ও একবার মায়ের মুখের পানে তাকায়, আবার দরজার দিকে উৎসুক দৃষ্টি ফেরায়—জগদীশ এখনো ফিরছে না কেন?

ওদিক থেকে তরুবালার বড় মামা বললেন—নাও এখন তাড়াতাড়ি এখান থেকে চলো! তোমাদের আদরের মেয়ে, লেখা-পড়া শিখিয়েছ—এখন ও যাতে সুখী হয় তাই করতে হবে। আমরা আর কদিন, আজ আছি কাল নেই।

সুরবালা বললেন—আমি ত তাই বলি, কিন্তু উনি বোঝেন কই! ওঁর ভয়, পাছে গরীবের হাতে পড়ে ওঁর আদুরে মেয়ে দুঃখু পায়। যাক বাবা, এখন ওসব কথা থাক। চলো,—

ফটিক রায় বলেন—অ, তুমি বুঝি সেই ডাক্তারী পাশ করা ছেলেটির কথা বল্ছ?

জগদীশ বাইরের বাগানে গিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। খোলা জানলার পাশে দাঁড়িয়ে সে কান পেতে ঘরের সব কথা শুনছে।

সুরবালা মাথা হেলিয়ে বলে—হ্যাঁ, ওই ছেলেটিকেই তরুর পছন্দ।

তরুবালা এবার মুখ তুলে বাধা দিল—মা! ওসব কথা এখন থাক্ না।

হরগোবিন্দ ব্যস্তভাবে বললেন—কিন্তু এখানে আর অপেক্ষা করা চলে না বড়বৌ!

তরুবালার মা বল্‌লেন—হ্যাঁ, এই যে! নে মা, আর দেরি করিস নে। কাপড় চোপড় বদলে নে।

রাঙাদি এতক্ষণে যেন স্বস্তির নিশ্বাস ফেলবার ফুরসৎ পেয়েছেন। তিনি আপন মনে বলেন—গোপাল, গোপাল!

রাঙাদি উঠে বাইরে গেলেন, সুরবালাও দরজা ভেজিয়ে দিয়ে বেরিয়ে যান!

তরুবালা পুনরায় তার পরিচিত পুরনো জগতে ছিটকে এসে দাঁড়ালো। কি যেন ঘটে গেছে গত কয়েক দিনে। কেমন একটা নতুন ছাঁচে কে যেন তার জীবনকে ঢেলে দিয়েছে। অতি পরিচিত আত্মীয়বর্গকে সে যেন আর চিনতে পারছে না।

চুপ ক'রে থাকে তরুবালা। তারপর কিছুক্ষণ এইভাবে কাটাবার পর সে বুঝতে পারে, তাকে যেতেই হবে। তা হোক। ও মনে মনে স্থির সংকল্প করে, জগদীশকে যেমন করেই হোক, ফিরিয়ে আনবে। ও চিনেছে, জগদীশ যেন ছাইমাখা মহাদেব। কয়েক মুহূর্তে ও স্থির করে ফেলল, সব কথা খুলে বলবে মায়ের কাছে।

ওদিক থেকে সুরবালা তাড়া দিচ্ছেন—কিরে কি হ'ল তোর, অ তরু !

—এই যে, যাই মা !

আর সময় দেবে না। শমনের মতো ভাগ্যের লিপি হাতে করে প্রতীক্ষা করছে যারা, তারা পার্থিব পরিচয়ে তরুবালার পরমাত্মীয়। তাদের দাবি অত্যন্ত বাস্তব।

দীর্ঘ নিশ্বাসে মনের বেদনা নিঃশেষ হ'য়ে যায় না। তবু নিরুপায় মানুষ এর বেশি কিছু করবার মত খুঁজে ত পায় না। তরুবালাও দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে নিজেকে প্রস্তুত করে। মায়ের বয়ে-আনা শাড়ি গহনায় নিজেকে সাজাতে সাজাতে কেবলই অনুপস্থিত জগদীশের কথা মনে পড়ে তরুবালার। জগদীশ কথাগুলো বলে ভালো, চুড়ি-পরা হাত ভালোবাসার বাঁধনে বাঁধা পড়বার জন্যে! কিন্তু কোথায় গেল সে ?

তরুবালা নব বেশে বেরিয়ে এল।

ওর মুখের পানে তাকিয়ে সুরবালার বুক কেঁপে ওঠে, বলেন—ও কি, তোর চোখে জল কেন মা ?

কথা বল্‌তে যেন তরুবালার গলা কাঁপে—তোমায় একটা কথা বল্‌ব মা ?

—কি বল্ ?

সুরবালার কণ্ঠস্বর যেন অন্য গ্রহ থেকে ভেসে এল। তরুবালার মনোলোকের সঙ্গে এ কণ্ঠের কোথাও সুরের মিল নেই। তরুবালা তাই পিছিয়ে গেল—ভাবলো, ওর মনের কথা সুরবালা বুঝবেন না, ভুল বুঝে শেষে অনর্থ বাধিয়ে বসেন যদি ? আশঙ্কা হ'তেই পারে।

জগদীশ যদি বিপদে পড়ে? তাই ও সামলে নিল। বললে—এখানে আমার টাকার বড্ড দরকার! ধার করেছিলুম, সে টাকা শোধ করে যাবো।

সুরবালা সস্মিত কণ্ঠে জবাব দিলেন—তা এর জন্যে ভাবনার কি আছে! সে ব্যবস্থা আমি করে দিচ্ছি। আর কিছু নয় তো?

রুদ্ধকণ্ঠে তরুবালা বলে—না, আর কিছু নয়, শুধু দেনা শোধ।

ঘরের চৌকিতে টাকার গোছাটা তখনো তেমনি ভাবেই পড়েছিল। সুরবালার দৃষ্টি পড়তেই তিনি সেটা তুলে নিলেন। মেয়ের দিকে একবার তাকিয়ে বললেন—কই আয়—!

—মা!

আকুল কণ্ঠে তরুবালা ডাকলো।

সুরবালা মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে বললে—আবার কি?

তরুবালা শত চেষ্টা করেও বাধার প্রাচীরটা ডিঙোতে পারে না। ওর বুকের মধ্যে উত্তাল ঝড় উঠেছে। যাবো না, যাবো না, ফিরে যাবো না তোমাদের ওই সুখের খাঁচাতে। কিন্তু মায়ের কণ্ঠস্বর কানে যেতেই আবার ও বাস্তবে ফিরে আসে বাধ্য হয়ে। জগদীশ ওকে ফিরে যাবার কথাই বল্‌তে এসেছিল। তার কাজ শেষ হয়ে গিয়েছে, এখন তাই সে এদের হাতে ফেলে দিয়ে ফিরে গিয়েছে, সে তার আপন-লোকে ঘুরছে—যেখানে নোংরা ধূলো কাদা, কাঁটা আর অন্ধকার সেই গ্রহেই জগদীশের যাত্রাপথ। সে হয়তো আর ফিরবে না।...কথাগুলো ভাবতে তরুবালার এতটুকু সময় লাগে না। তাই সুরবালার প্রশ্নের উত্তরে সংক্ষিপ্ত উত্তর দিল! বললে—না, কিছু নয়! চলো।

সুরবালা বললেন—তোর দেনা?

তরুবালা উদাসীন কণ্ঠে উত্তর দিল—থাক, কিছু ঋণ নয় রইলই!

সুরবালা মাথা নেড়ে বললেন—না, না, পরের টাকা ধার করলে সুদশুদ্ধ শোধ করতে হয় মা। কার কাছ থেকে নিয়েছিস্ বল্!

রহস্যমাখা হাসি মেলে তরুবালা বললে—তাকে এখন খুঁজে পাবে কোথায় তুমি? সে চলে গেছে হয়তো।

রঘুনাথ অদূরে দাঁড়িয়ে সব কথাই শুনতে পায়। সে মনে মনে জগদীশের উপর যৎপরোনাস্তি চটেছে। এর উপর তরুবালা জগদীশকে টাকা দিতে চলেছে শুনে রঘুর ভ্রূ কুঞ্চিত হয়ে ওঠে। সে মনে মনেই বললে—সেই বদমাসের যাশুটাকে একবার পেলে হয়! আবার টাকা।

সুরবালা বললেন—আচ্ছা সে যাতে টাকা পায় সে বন্দোবস্ত ক'রে দেবো। এখন চল্!

ছকুকে আড়ালে ডেকে রঘুনাথ বল্‌লে—দেখলি ত?

ছকুলাল বিজ্ঞভাবে ঘাড় নেড়ে সায় দিল—আপনার কথাই সত্যি, লোকটা পাকা শয়তান। এখানে থাকলে ঠিক মার খেয়ে মরতো!

রঘুনাথ হাসতে হাসতে বলে—বাঘের মুখের শিকার ফস্‌কে গেল! ব্যাটা আমাকে হাতে পেলে আর আস্ত রাখতো না। আর নয় বাবা, এবার আমি কেটে পড়ি।

পর পর তুখানা মোটর বোঝাই হয়ে স্টার্ট দিল। আশ পাশে ভিড় আরও বেড়েছে। তাদের কলগুঞ্জন ক্রমশ বাড়তে থাকে।

অশ্রুমুখী তরুবালা গাড়ির জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে থাকে। ওর দৃষ্টি যেন কাকে খুঁজে ফিরছে।

গাড়ি চলেছে। তরুবালা বাইরে চেয়ে রয়েছে। ওর চোখে অশ্রুধারা। হঠাৎ মনে হ'ল—ওই যেন আগে আগে অতি পরিচিত মানুষ চলেছে, সামনের পথে! হ্যাঁ, সে-ই বটে! তরুবালার চোখের দৃষ্টি নিমেষে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। গাড়ি আরও কাছে এসে পড়েছে। আরও কাছে। তরুবালার বুক দুরু-দুরু করে। লাফিয়ে পড়তে চায় ও গাড়ি থেকে। ওর দুচোখে বাসনা ব্যাকুল দৃষ্টি।

জগদীশ একবার ঘাড় ফিরিয়ে দেখলে তার দিকে তাকিয়ে রয়েছে তরুবালা। নিমেষের জন্য চারটি চোখ মিলিত হ'ল। সামনাসামনি জগদীশ আর তরুবালা দুজনে দুজনকে দেখল। এই লহমার পরিচয়টুকুই যেন বাকী ছিল।

তারপর!

তরুবালাকে নিয়ে বিরাট সিডান বডি গাড়িখানা ধুলো উড়িয়ে আপন গতিতে সামনে মিলিয়ে গেল। জগদীশ দাঁড়িয়ে রইল, স্তব্ধ বিভ্রান্ত একটি মানুষ। যার পিছনের অতীতে আর ফিরে যাবার অভীপ্সা নেই। আর সামনে এগিয়ে যাবার পথও রুদ্ধ। জগদীশ একলা চলার পথে একমাত্র পথিক। তার সঙ্গী শুধু, তরুবালার পিছনে ফেলে যাওয়া অশ্রুনন্দিত শুভদৃষ্টি।

চুপ ক'রে জগদীশ এক জায়গায় ব'সে একটি পাথরের ঢেলা নিয়ে পথের ধুলোর ওপর কি যেন আঁকতে লাগলো।

॥ আঠারো ॥

গ্রহে গ্রহে সংঘাত লাগে কি না জগদীশ জানে না, তেমনি সে জানে না সংঘাতের প্রতিক্রিয়া কি ভাবে প্রকাশ পায়, কি ভাবে ছড়িয়ে পড়ে অন্তহীন নীলিমার নানা স্তরে, বিচিত্র রূপে! সে জানে না অনেক কিছুই। এমন কি সে নিজেকেও ভালো ক'রে চেনে নি এখনো। তাই কক্ষচ্যুত হয়ে উদ্দেশ্যহীনভাবে তার পথ পরিক্রমা শুরু হ'ল। কিছুই তার ভালো লাগে না। অবশ্য ভালো লাগা না লাগার এই বোধটুকু জগদীশের মনে এত বিরাট আকার নিয়ে এর আগে কখনও দেখা দেয় নি। একেবারেই যে দেয় নি, সে কথা বললে ভুল হবে। হ্যাঁ, একবার এ রকম হয়েছিল বটে। তবে তখন সে কেবল নাড়া খেয়েছিল। একটা কালো হাওয়া যেন তাকে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়িয়ে ছিল। সেই তাড়না তাকে গ্রামছাড়া করল, করল স্নেহময়ী মায়ের কাছ ছাড়া। কিন্তু শহর কলকাতার হাজারো রং-এর নেশা জগদীশকে গ্রাস করে ফেলতে বেশি দেরি ত করে নি।…এবারের এই এলোমেলো পাগল হাওয়ার চেহারা কিন্তু অন্য রকম। পৃথিবীর সব কিছুকে অস্বীকার করতে, চেনা-জানা সমাজের ধারকাছ বর্জন করতে, জগদীশ বদ্ধপরিকর। কিন্তু কোথায় যাবে সে?

তরুবালা হাওয়া-গাড়িতে চড়ে চলে গিয়েছে। পিছনে যে উৎসুক, উজ্জ্বল, সজীব, মুখর, চাহনী রেখে দিয়ে গেল—সে দৃষ্টির কি অর্থ? অমন ক'রে যদি তাকালো, তবে কেন তরুবালা চলে গেল? তবে কি জগদীশ যা শুনেছে জানলার আড়ালে দাঁড়িয়ে সেটাই সত্যি? —ডাক্তারি পাশ করা ছেলেটিকে তরুবালা ভালোবাসে। তা হবে। ...কিন্তু তা-ই যদি সত্য হয়, তবে কেন জগদীশের দিকে যাবার বেলায় পিছু-ডাকা চাহনীতে তাকিয়েছিল? হয়তো দুদিনের সঙ্গীকে শেষ উপহার দিয়ে, ঋণ শোধ করে গেল!

সিগারেট ছেড়ে জগদীশ বিড়িতে পৌঁছেছে—হোটেল ছেড়ে তেলেভাজা আর ছাতু! তবু তরুবালার কথা কেন মন থেকে ঝেড়ে ফেলতে পারছে না! যে তার কেউ ছিল না, থাকা সম্ভবও নয়—তার জন্যে এইভাবে বাজে সময় কেন নষ্ট করা।

আর কিই বা করতে পারে—জীবনের কোনো নির্দিষ্ট অর্থ সঙ্কেতই নেই যে।

এমনি ক'রে ঘুরে ঘুরে কয়েকটা দিন কেটে গেল। চলতি পথে পিছনে ফেলে আসা দিনগুলির হাতছানি—যে দিনগুলি ছিল একদা অত্যন্ত দুঃখকষ্টের, আজ তাই যেন অমৃতমাধুর্যের আধার, তার স্মৃতি চারণায় একটা অনির্বচনীয় সুখস্বাদ পায় জগদীশ।

সহসা সে স্থির ক'রে ফেল্‌ল গ্রামে ফিরে যাবে। নিজের গ্রামে। যে গ্রামে মাকে ফেলে রেখে, একদিন দুনিয়ার হাটে নিজেকে নিয়ে ফেরি করতে বেরিয়েছিল—সে-ই হচ্ছে জগদীশের আপন গ্রাম।

সেখানে এখনো মা রয়েছেন কি? তাঁর কাছে ফিরে যাবার এখনো হয়তো সময় রয়েছে। মাকে দেখবে জগদীশ। পৃথিবীতে তিনি কেবলই লাঞ্ছনা কুড়িয়েছেন। স্বামীর কাছে অকারণ নির্যাতন, পুত্রের অপকীর্তির গ্লানি, এছাড়া আর তিনি কিছুই ত সঞ্চয় করতে পারেন নি। জগদীশ আজ মাতৃদর্শনে যাবে। মাকে তার বড় দরকার।

একদিন এসব কথা জগদীশ ভাবতে পারতো না। সে যে পৃথিবীকে চিনেছিল, জেনেছিল যে সমাজের মানুষকে, তার মধ্যে আশা-আশ্বাসের কোন স্থান ছিল না। সেই বিরাট মানুষের হাটে কেবল বেচাকেনা আর মুনাফার কারচুপি। টাকার গোলকধাঁধায় সবাই সেখানে ঘুরে মরে। মানুষের মনের দিকে নজর দেবার কোনো প্রশ্ন নেই। কিন্তু আজ জগদীশের কাছে মনটুকুই সব—সবটুকুই মন। মনের বাইরে আর কিছু নেই। সে তাই মায়ের কাছে ফিরে যেতে চায়। মাকে দু'দণ্ডের শান্তি দিয়ে সামান্য কিছু সান্ত্বনা পেতে তার মন পিপাসার্ত।

অতএব উদ্দেশ্যহীনতার অবসান ঘটলো। জগদীশ তার পিতার জমিদারিতে ফিরবে না। মায়ের গোয়ালঘরের খোঁজেই তাকে যেতে হবে।

সেদিন দুপুর নাগাদ জগদীশ পৌছলো রাজাগঞ্জের বাজারে। গঙ্গার তীরে ছোট্ট বাজার নিকিরিদের কারবার, কথা-কুথান্তর, আনাগোনাতে প্রাণমুখর। জগদীশ ঘাটে নেমে মুখ হাত ধুয়ে এক আঁজলা জল খেয়ে নিয়ে নবাবী সড়কে উঠল।

একজন বৃদ্ধ পথিক তাকে প্রশ্ন করে—হ্যাঁ বাওয়া ঠাকুর, এ পথ কম্‌নে গ্যাছে?

জগদীশ একটু হেসে জবাব দেয়—তোমার তো বয়েস হয়েছে, তা পথ চেনো না?

—আর বাবাঠাকুর আমরা হলাম গেঁয়োগুর্বো চাষাভুষো, শহরের পথ চিনি কি করে! তা হ্যাঁ বাওয়াঠাকুর, কম্‌নে যাওয়া হবে তোমার?

—সোজা সাম্‌নে।

—তা আমিও যাবো তো উদিকেই, মেয়ের ভারি অসুখ—সম্বাদ পেয়েছি। আছে কি না কে জানে!

—ক'দিন আগে খবর পেয়েছ?

—তা হলো বেশ কয়দিন, গত মাসে পুন্নিমের আগে যে একাদশী পড়লো সেদিনে। কি করি বাবা, হাত অবসর পেলে তবে না গিয়ে কথা!

—অ! তা বেশ করেছ। মেয়ের অসুখ সেরে গেছে হয়তো।

বৃদ্ধটি জগদীশের মুখের পানে তাকিয়ে খুশির সুরে বলে—আহা, তাই যেন হয়, বড় ভাবনাতেই পড়ে ছ্যালাম।

জগদীশ একটা বিড়ি দিল বৃদ্ধকে।

একগাল হাসি হেসে বৃদ্ধ বললে—তুমি বাবা দেবতা না অবতার! দিব্যি বলে দিলে মেয়ে আমার ভালোই আছে। তা একটা কথা বলি বাবাঠাউর—

—বলো!

—তুমি যেমন বললে বাবাঠাউর, মেয়েটা ভালো রয়েছে, তাহলে

আমি আবার যাই কেন? উদিকে মেজো বক্‌নাটা গাভীন হয়েছে—আজ বিয়োয় কি কাল বিয়োয়!

বিড়িতে গোটা কয়েক টান দিয়ে বৃদ্ধ উল্টো দিকে চল্‌তে শুরু করে। সে আর মেয়ের বাড়ি যাবে না।

আপন মনেই হাসে জগদীশ।...মানুষের মন বড় বিচিত্র! মেজো গাইটার জন্যে দরদটাই বেশি, নিজের মেয়ের অসুখটা তুচ্ছ। গাইটা দুধ দেয়, সংসারের যৎকিঞ্চিৎ স্বাচ্ছন্দ্য জন্মায়। কিন্তু মেয়ে—যে মেয়ের বিয়ে হয়ে গেছে, তার কাছে লভ্য কিছু নেই। নবাবী সড়কের সামনে সোজা তাকিয়ে জগদীশ আবার চল্‌তে শুরু করে। আবার মনে পড়ে তরুবালার কথা। ওর মিনতিমাখা দৃষ্টি এখনও তার সঙ্গী।

গ্রামের পথে অনেক কাল পরে সূর্য উঠতে দেখল জগদীশ। পূবের মাঠে শালিখের দল কলগুঞ্জন করছে। এখানে-ওখানে কালকাসুন্দের ঝোপ। ও কে? হ্যাঁ, চিনেছে ঠিক জগদীশ—কানাই মোড়লই বটে। বাহুর পেশী এখনও তেমনি শক্ত, দেহের গঠন সুঠাম সুন্দর।

হাঁক দিল জগদীশ—ও কানাই দাদা!

—কে ডাকে?

কানাই এগিয়ে এল।

জগদীশ একগাল হেসে বললে—ভালো আছো?

—হ্যাঁ! কিন্তু আপনাকে ত চিনতে পারলাম না!

ব'লে কানাই জগদীশকে বেশ ভালো ক'রে লক্ষ্য করতে থাকে।

জগদীশ দেখল, কানাই-এর ভ্রূর চুলে পাক ধরেছে।

বেশ ভালো ক'রে দেখে কানাই হাসলো—হ্যাঁ, হ্যাঁ, সেজ মাসীমার ছেলে না! তুমি আমাদের জগদীশ! তাই বলো, চিন্‌তে পারি নি! অপরাধ নিয়ো না দাদা।

ব'লে কানাই ব্যস্তভাবে কাঁধের বাঁশ, হাতের কাটারি মাটিতে নামিয়ে রেখে গড় হয়ে প্রণাম করল জগদীশকে।

দু-পা পিছিয়ে গিয়ে জগদীশ বলে—আহা ওকি করো!

—আহা ব্রাহ্মণ! তোমাদের দেখলেও পুণ্যি।

জগদীশ প্রশ্ন করে—তা তোমাদের সব খবর কি?

—আর খবর দাদাঠাকুর! তোমার মা ত কয়েক সন হ'ল স্বর্গে গেলেন। আহা তাঁর কষ্ট চোখে দেখা যায় না—তা গিয়েছেন না বেঁচেছেন! তা তুমি এ্যাদ্দিন কোথায় ছিলে দাদা? সরকারী চাকরী করো বুঝি। তাই অবসর পাওনা?

মায়ের মৃত্যু সংবাদ শুনে জগদীশ একটা ধাক্কা খেয়ে গেল। এই জন্মভূমির ধূলোবালির ওপর শুয়ে একবার যদি প্রাণভরে সমস্ত জীবনের অবরুদ্ধ কান্না সে ডাক ছেড়ে কাঁদতে পারতো! কিন্তু সে কিছুই করলো না। সেইখানে দাঁড়িয়েই শান্ত কণ্ঠে শুধু বললে, না, কিছুই করিনে, তাই আসতে পারি নে।

—কিছুই করো না? তা বে-থা ঘরসংসার করছ ত?

—না দাদা, আমার কপালে ওসব লেখেনি।

—তা ভাই ভালোই আছো। যা বাজার পড়েছে, ঘরামীর কাজ করতাম তা বাজার মন্দা—ভাবি কি দিয়ে কি করি!

কানাই কাঁধের বাঁশখানা তুলে নিল। বললে—আছো তো ক'দিন দাদা!

—থাকার কিছু ঠিক নেই। কোথায় থাকবো বলো?

দীর্ঘশ্বাস ফেলে কানাই বললে—তাই বটে! বাপ জমিদার, মামা জমিদার—সবই রয়েছে এমন বিবাগী হয়ে কোন্ দুঃখে যে ঘুরে বেড়াও বুঝিনে ভাই। আচ্ছা দাদা আসি এখন।

জবাব দিল না জগদীশ।

ইচ্ছে করছে সেই গোয়ালঘরখানা একবার চোখের দেখা দেখে যাবে জগদীশ। কিন্তু তা-ই বা কেন! এবার ফিরলেই ত হয়! মা নেই! নেই মা? কেউ নেই এ গাঁয়ে। নেই এ পৃথিবীতে তার আপন বলতে কেউ! কেন এমন হয়? যে মাকে সে এতকাল দেখে নি, দেখতে চায়নি—দশ বছর পরে হঠাৎ তিনি না থাকার সংবাদটা কেন জগদীশকে বিচলিত করল?

পথ চলতে চলতেই জগদীশ ভাবছিল এইসব কথা।

হঠাৎ তার পথ আগ্‌লে এক প্রৌঢ়া দাঁড়াতে জগদীশ থমকে তাকালো।

প্রৌঢ়া ভ্রূকুঞ্চিত করে বললে—তুমি না সেই যজ্ঞেশ্বর চক্কত্তির ছেলে জগদীশ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ!

—অ! তা হঠাৎ যে এ গাঁয়ে? কি মনে করে, বাছা?

হেসে জগদীশ উত্তর দিল—এলাম, এমনি—ইচ্ছে হ'ল।

চোখ ঘুরিয়ে প্রৌঢ়া বললে—ইচ্ছে! তা ইচ্ছে না হ'লেই ত ভালো ছিল। তোমার কীর্তিকলাপের কেলেঙ্কার ত জানতে বাকী

নেই, বাছা। তাও বলি, বাপ্ কা ব্যাটা—গুণ যাবে কম্‌নে। ভগবান বাঁচিয়েছেন,—আমার নাতনীটির ওপর যেরকম নজর টেঁকে ছিলে, তা যাক্, সে এখন সুখেস্বচ্ছন্দে শ্বশুরঘর করছে ছেলেমেয়ে নিয়ে।

—ও—

প্রৌঢ়ার মুখে কুটিল হাসি ফুটে ওঠে, বলে—তা হ'লে সে গুড়ে বালি বুঝলে ত! না কি আবার নতুন মতলব নিয়ে এসেছ—ওই রায়েদের বাড়ির ওপর তাক্ করছ? সুবিধে হবে না বাপু, ওদের বন্দুক আছে দোনলা।

অন্য সময় হ'লে জগদীশ দশ কথা শুনিয়ে দিত। কিন্তু আজ সে পৃথিবীর সব মানুষকেই করুণার দৃষ্টি দিয়ে দেখতে পায়। কি হবে প্রৌঢ়ার সঙ্গে কথা কাটাকাটি ক'রে। একটু হাসলো সে—তারপর পাশ কাটিয়ে চলে গেল।

প্রৌঢ়া একবার পিছন ফিরে জগদীশকে দেখে নিয়ে আপন মনে বিড় বিড় ক'রে বলে চলল—ছোঁক-ছোঁক ক'রে ঘুরছে। গাঁয়ে নিদেন চুরিদারি হবে! যাই এখন গেরস্থদের সাবধান ক'রে দিই। মুখ দেখলে ধরবার উপায় নেই, কিন্তু—

চৌধুরী পাড়ার আখড়াতে সুদাস বৈরাগী আপন মনে গান করছে—একতারার একহারা সুরের সঙ্গৎ বড় মধুর লাগে জগদীশের। তুলসীমঞ্চের পাশে দাঁড়িয়ে সে গান শোনে—

একটি শ্যাম শুকপাখী সুন্দর নিরখি
রাই ধরল নয়ন ফাঁদে।
তারে হৃদয় পিঞ্জরে রাখিল সাদরে
মনহি শিকলে বেঁধে।...

সুদাসের কণ্ঠে দরদ উপচে পড়ছে। চোখে সে দেখতে পায় না। কি জানি মনের দরজা হয়তো খোলা, সেখান দিয়ে আলো ঢোকে অনেক বেশি।…দীর্ঘনিশ্বাস পড়ল। জগদীশ আর দাঁড়ায় না। তরুবালার মুখখানা তার চোখের সামনে ভেসে বেড়াচ্ছে।

এ গাঁয়ে জগদীশের ঠাঁই নেই, এখানে থাকবে না। মা নেই। তিনি জগদীশকে মুক্তি দিয়ে গেছেন। তরুবালাও ত তাকে ফেলে চলে গেছে—তবে কেন জগদীশ ওকে ভুলতে পারছে না!

॥ উনিশ ॥

হরগোবিন্দ চৌধুরীর নামডাকের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে অট্টালিকায় সজ্জা সমারোহ। গঙ্গার উপর বাড়ি এবং বাগান নিয়ে তিরিশ বিঘার ঘেরা লম্বা প্রাচীর। দেউড়িতে বন্দুকধারী পাহারা, এখনো পেটাঘড়ি বাজে প্রতি ঘণ্টায়।

গাড়ি বারান্দার এক কোণে এ্যাল্‌শেসিয়ান কুকুর বাঁধা রয়েছে গোটা চারেক, গ্রেট ডেন, গ্রে হাউণ্ড, বুল্‌টেরিয়ার, পিকিনিজ কুকুরের ছড়াছড়ি! দাঁড়ে ব'সে কাকাতুয়া চিৎকার করছে! চাকর বাকর ছুটোছুটি করছে! কৃত্রিম পাহাড়ে একটি সাদা ময়ূর অলস দৃষ্টিতে তাকিয়ে কি যেন ভাবছে।

তরুবালা নিজের ঘরে বই কোলে ক'রে বসে, সামনের দিকে তাকিয়ে কি যেন ভাবছে। ওর চোখ দেখলেই বেশ বোঝা যায় যে ওর মন এখানে নেই।

কলকণ্ঠের ধ্বনির ধাক্কায় তরুবালা চম্‌কে উঠল। দরজার দিকে তাকিয়ে দেখল দুটি অল্পবয়সী মেয়ে চপলা কুরঙ্গীর মতো ঘরে ঢুকলো।

—কি করছ এখানে একা, তরুদি ?

অনুপমা প্রশ্ন করে।

—পড়ছি।

শোভা অনুযোগ জানিয়ে বলে—আজ বাদে কাল বিয়ে, তুমি পড়ছ? না ভাই লুকোচ্ছো, বই আড়াল দিয়ে বাসরের স্বপ্ন দেখছ!

অনুপমা চোখদুটি বিস্ফারিত ক'রে বলে—সত্যি তরুদি, তোমার যা জড়োয়ার সেট হয়েছে না—সুপার্ব! দিল্‌দারনগরের রূপকুমারীর যে সেট দেখে তোমার চোখ জ্বলে উঠেছিল এক্‌জ্যাক্‌ট্‌ সেই সেট। যেমনটি পছন্দ করো ঠিক তেমনি—

তরুবালা ম্লান হাসি হেসে বললে—পছন্দ? চিরকাল কি পছন্দ এক থাকে? বদলায়।

শোভা বলে - কথা শোনো একবার! মাসিমা, মেসোমশাই একযোগে তোমার পছন্দের সঙ্গে ছক মিলিয়ে সব ব্যবস্থা করছেন—শাড়ি গয়না থেকে শুরু করে বরটি পর্যন্ত।

অনুপমা সায় দিল—তা বইকি। গরীব ব'লে ওঁরা ত পিছিয়ে যাননি, তোমার পছন্দের কাছে আত্মাহুতি দিয়েছেন।

অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে তরুবালা একটু হাসলো, তারপর বইতে মনোনিবেশ করতে চেষ্টা করল।

শোভা কাছে এসে তরুবালার চেয়ারে ঠেস দিয়ে বলে—তুমি অমন গম্ভীর থাকো কেন ভাই আজকাল?

অনুপমা বলে—টেনিস খেলা ছেড়ে দিয়েছ, মোটর ড্রাইভিং তাও নয়, সাইক্লিং-এর অত নেশা সেটাও বন্ধ করেছ, বলো তো! বিয়ের আগেই এই। এরপর ত তোমার নাগাল পাবো না ভাই।

তরুবালা এককথায় এড়িয়ে গেল—ভালো লাগে না।

শোভা রসিকতা ক'রে বললে—আর ক'টা দিনই বা—তারপর ত তোমার ওই পটে আঁকা ফটোর মানুষটি সশরীরে হাতের মুঠোয় ধরা দেবে।

তরুবালা গম্ভীরভাবে একবার তাকালো। ওর চোখের দৃষ্টিতে শ্রাবণের বিষণ্ণ মেদুরতা। অনুপমা তাকলো শোভার দিকে—ওদের চোখে চোখে কি কথা হ'ল।

অনুপমা বললে—তরুদি তোমার কি হয়েছে বলো দেখি, অমন কান্নাকান্না কেন?

চম্‌কে উঠল তরুবালা। ওর দুচোখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, বলে—কান্না কেমন ক'রে জানলি!

শোভা গুছিয়ে বলে—এই সব ছেড়ে যেতে হবে তাই বুঝি কষ্ট হচ্ছে! কিন্তু কি করবে প্রিয়তমকে পেতে গেলে অনেক প্রিয়জনকে ছাড়তে হয়, এ আর কে না জানে!

তরুবালা উদাসকণ্ঠে বলে—প্রিয়তম? প্রিয়জন কে? কার কথা বল্‌ছিস?

তরুবালার কথা শেষ হবার মুখে সুরবালা ঘরে ঢুকলেন। শোভা আর অনুপমা প্রণাম করল তাঁকে।

সুরবালা হেসে বললেন--ওমা, তোরা কখন এলি একবার দেখাটা করবি তো, না একেবারে তরুর কাছে। বিয়ের গন্ধ বুঝি বড্ড মিষ্টি হ্যাঁরে অনু?

শোভা আর অনু মাসির সামনে সঙ্কুচিত হয়ে পড়ে।

সুরবালা হেসে বললেন—কথায় বলে ভবিতব্যি—মূলাধার।

নইলে কোথায় সাতপুকুরের জমিদার আর কোথায় মেডিক্যাল কলেজের ডাক্তার। যার হাঁড়িতে যে চাল দিয়েছে।

অনুপমা আর শোভা মুখ টিপে হাসে। সুরবালাও হেসে ফেললেন ওদের দিকে তাকিয়ে। তারপর বললেন—যাই বলো বাপু, একেলে ফ্যাসানের লাভ লোকসানের ব্যাপার ত আমাদের সেকেলে ঘরে চলবে না। ছবি দেখে পছন্দ! ওরাও ছবি দেখে মেয়ে পছন্দ করল, আর আমাদের তরুও ছেলের ছবি দেখেই পছন্দ করেছে।

কথা বল্‌তে বল্‌তে সুরবালা দাসীকে ডাকলেন—কই খ্যাঁদার মা, বেনারসীগুলো এদিকে আনো। আর, ছাখ মা তরু, বেনারসীর আবার ডিজাইন-টিজাইন আমি বুঝি নে, কমলাপতি ছগনলালের লোক এসেছে শাড়ি বয়ে নিয়ে—তুই পছন্দ ক'রে নে।

তরুবালা গম্ভীরভাবে উত্তর দিল—ছবি পছন্দ করেছি বলে কি আমায় শাড়ি পর্যন্ত পছন্দ করতে হবে মা? ওসব আমি পারব না, যা হয় তোমরা করোগে।

সুরবালার মুখ অন্ধকার হয়ে আসে—আমার হয়েছে এক জ্বালা! মেয়ের আর মন ওঠে না কিছুতেই। এখন চারহাত এক ঠাঁই হলে আমার হাড় জুড়োয়।

বিরস বদনে সুরবালা বললেন—যাই, ওদিকে ওঁর আবার খাওয়া হয়নি, দেখি—

অনুপমা অভিমানাহত স্বরে বললে—তোমার জন্যে আমার দিনটাই আজ মাটি হ'ল তরুদি!

—কেন রে?

তোমার পাকা দেখার দিনে কোথায় সাজিয়ে দিতে এলুম, আর তুমিই রইলে মুখ ভার ক'রে!

তরুবালা ম্লান হাসি হেসে জবাব দিল—সাজ-সজ্জায় আমার আর কোনো মোহ নেই ভাই—

শোভা বললে—তুমি ত এমন ছিলে না ভাই।

আপন মনেই তরুবালা আঁচলের কাপড় আঙুলে জড়াতে জড়াতে বলে—কেমন ছিলুম মনে নেই। কিন্তু এই জন্মেই হয়তো আমার জন্মান্তর ঘটে গেছে!

অনুপমা আর শোভা মর্মাহত হয়েছে তরুবালার ঔদাসীন্যে। ওরা মুখ চাওয়া-চাওয়ী ক'রে যেন কোন রহস্যের সন্ধান খোঁজে।

অবশেষে শোভা বললে—তোমার কি শাড়ি গয়না কিছুই পছন্দ হয়নি, তরুদি! এখনো বল্‌তে পারো, মেসোমশাইকে দিয়ে অন্যরকম বন্দোবস্ত করা যায়।

তরুবালা গভীর তাচ্ছিল্যভরা দৃষ্টি দিয়ে ওদের দিকে একবার তাকিয়ে বারান্দায় চলে গেল।

কি বল্‌বে তরুবালা? এ কথা কি হাটের মাঝে মেলে ধরা চলে? অনেক ভেবেছে ও একা-একা। কাউকে দোষ দিতে পারে না। তার বাবা-মা ত তারই কথামতো ডাক্তার ছেলেটিকেই পাত্র হিসেবে মনোনীত করেছেন। তাঁদের দিক থেকে কোনো অবিচারের অবকাশ রাখেন নি। ভেবেছিল তরুবালা জগদীশের কথা মন থেকে মুছে ফেলে দেবে। কিন্তু পারলো কই। সেই যে হাত ধরে চুড়ি পরিয়ে দিয়েছে জগদীশ, সেই যে সমাজের নির্যাতনের কাহিনী শুনিয়েছে জগদীশ, যে জগদীশ তাকে পথে পথে নিয়ে ঘুরে ফিরেছে,

যে জগদীশ ট্রেনের কামরাতে উদাসীনভাবে পোড়া জামাকে উপেক্ষা ক'রে পাশ ফিরে শুয়েছে—সেই জগদীশকে তরুবালার পক্ষে ভুলে যাওয়া অসম্ভব। রাঙাদি ঠিকই বলেছিলেন—সবই চেনো, কিন্তু নিজেকেই চেনো না! সত্যি তরুবালার নিজেকে চিনতে দেরি হয়ে গেছে। পাত্রের ফটো পছন্দ করার সময় ও ভেবেছিল এক রকম। আবার জগদীশকে দেখে ভাবনার মোড় ওর পাল্টে গেল। তারপর যখন জগদীশকে ছেড়ে চলে এলো,—তখন নিজের সঙ্গে বোঝাপড়া করবার আশা ভরসা কম করেনি। ভেবেছিল জগদীশ পথের মানুষ, তাকে ঘরে আনার স্বপ্ন মুছে ফেল্‌তে পারবে। কিন্তু যতই সময় বয়ে যাচ্ছে ততই যেন জগদীশের ভাবনা ওর চারিদিক বেষ্টন ক'রে ঘিরে রাখছে। না, পারবে না তরুবালা। ভাগ্যের হাতে এইভাবে খেলনা হয়ে সারাটা জীবন কি ক'রে কাটাবে? আর—জগদীশেরই বা কি হবে? সে যদি ফেরে।...না, না, না!...এখনো সময় আছে। যদি তরুবালা এ বিয়েতে আপত্তি করে তাহলে সবাই নিন্দে করবে। তা করুক—নিন্দা প্রশংসায় কিছু এসে যায় না ওর।

তরুবালা যখন নিজের মনে ভাবনার জাল বুনে চলেছে তখন হরগোবিন্দর সামনে সুরবালা ভাতের থালাটা নামিয়ে দিতে গিয়ে হয়তো একটু অসাবধান হয়ে পড়েছিলেন।

প্রাচীন জমিদার বংশের ধারানুক্রমে হরগোবিন্দর চোখকান খুব সজাগ। তিনি ভাতের থালা নামানোর আওয়াজে একটু হেসে স্ত্রীর মুখের দিকে তাকালেন—কি, বড়বৌ, ব্যাপার কি?

সুরবালা গম্ভীর ভাবে উত্তর দিলেন—কি আবার, আদুরে মেয়ে তোমার !

—আহা মেয়েকে আদর দেবো না ! আমার মেয়ে—

—বেশ তাই দাও। আমি আর এ সংসারের কিছুতে নেই—

হরগোবিন্দ হাসেন, বলেন—বেশ, বেশ, তাই হোক। কোনো কিছুতেই থাকতে হবেনা, কেবল সাতে-পাঁচে থাকলেই চল্‌বে, বড়বৌ।

সুরবালা ক্ষুণ্ণকণ্ঠে বলেন—এসব হাসি তামাসার কথা নয়। মেয়েকে এখন সামলাও—

হাসতে হাসতে হরগোবিন্দ বললেন—আহা অতো ধৈর্য হারালে চল্‌বে কেন। বয়েস হয়েছে ওর, এখন বাপ-মায়ে সামলাতে পারবে কেন? তাই ত এত ঘটা ক'রে মেয়ে সামলাবার জন্যে পরকে ডাকা! গ্যাখো না, বিয়ের জল গায়ে পড়ুক একবার, তখন সব ঠিক হয়ে যাবে।

—আমার আর দেখতে বাকী নেই। ভালো হ'লেই ভালো। তবে মেয়ের রকমসকম দেখে বেশ বুঝছি যে, যে-মেয়ে ঘর থেকে একবার বাইরে পা বাড়িয়েছিল, সে-মেয়ে আর ঘরে ফেরেনি! মেয়ে একেবারে বদলে গেছে।

হরগোবিন্দ এবার গম্ভীর হয়ে বল্‌লেন—কিন্তু এ পাত্র ত ওরই পছন্দ করা বড়বৌ।

—জানি নে, তুমি ওর সঙ্গে এসব কথা কও গিয়ে। আমি ওসব বুঝিনে।

হরগোবিন্দ চিন্তিতভাবে বললেন—হুঁ! তা যাই বলো, কথায়

কথায় মেয়ের কাছে নাকেখৎ দিতে পারবো না। সে ত আমার কাছে মুখ ফুটে কিছু বলে নি। খামোখা তুমি ভেবে মরছো বড়বৌ। আর, ছ্যাখো, ওকে লেখাপড়া শিখিয়ে মানুষ করেছি—আমার কাছে অন্তত লুকোবে না। তেমন কিছু হ'লে বল্‌তো আমাকে।

—বেশ ত, তাই ভালো!

ব'লে সুরবালা উঠে গেলেন।

চৌধুরীপরিবারে আনন্দ উৎসবের আয়োজনে এতটুকু খুঁৎ নেই। হরগোবিন্দ চৌধুরীর নজর সবদিকে সমান সজাগ। আত্মীয়, আশ্রিত, অভ্যাগত সকলেই একবাক্যে স্বীকার করে যে,—বংশের মর্যাদা এমন লোকের হাতে বাড়ে বই কমে না। বৈঠকখানা ঘরে আড্ডা গশগুল চলেছে। অন্দরে নারীসমাজের জমজমাট আসর।

এর মধ্যে তরুবালা নিজেকে কিছুতেই খাপ খাওয়াতে পারে না। অবশ্য তা নিয়ে পাঁচজনের বড় একটা মাথাব্যথা নেই—বিয়ের কনে, তার একটুখানি লজ্জা সঙ্কোচ থাকাটা সুলক্ষণ বই কি। অতএব বাইরের কেউ টেরও পায় না তরুবালার আসল অবস্থাটা। সোরগোল চলেছে আপন নিয়মে। তরুবালাও নিজের নিভৃত মন নিয়ে ব্যস্ত।

বিকেল গড়িয়ে আসে অথচ হুটু-ময়রার দেখা নেই। হরগোবিন্দর শ্বশুরবাড়ির সুবাদে হুটু ময়রা বায়না পেয়েছে তরুবালার পাকাদেখার

যাবতীয় মিষ্টান্ন সরবরাহের। বেলা বারোটার মধ্যে তার এখানে পৌঁছবার কথা। কিন্তু তিনটে বাজতে চল্‌ল হুটুর কোনো পাত্তা নেই। ফটিক রায় ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। মাঝে মাঝে বল্‌ছেন—এইজন্যে গৈগিরামের লোকদের ওপর ভরসা করতে নেই। আগেই ত বলেছিলুম, হুটুর আর সব ভালো, কেবল টাইমের বেলাতে হুঁশ থাকে না।

মুহুরি গোমস্তারা ছুটোছুটি করছে।

রাঙাদি রনুকে ডেকে বল্‌লেন—তুমি একটু এগিয়ে দেখলে পারতে বাবা।

হরগোবিন্দ হেসে উঠলেন—আহা অত ব্যস্ত হবার কি আছে, সে ঠিক আসবে।

তাঁর মুখের কথা শেষ হতে-না-হতে শোনা গেল—পেন্নাম হই দেবতাদের চরণে, হুটু হতভাগা এসে পড়েছে।

সবাই সমস্বরে হৈ-হৈ ক'রে উঠ্‌ল—আরে হুটু আমাদের তেমন মানুষই নয়। তার কথা মানেই কাজ!

ছাতাটা এককোণে রেখে হুটু প্রণামাদি সেরে কাঁধের গামছা ঘুরিয়ে একটু হাওয়া খেতে খেতে বলে—তা আমাদের দিদিমণি কোথায়? যার জন্যে হুটো হতভাগা এত খেটে মরল, সেই দিদিমণি একবার এসে দেখবেন নি—?

রাঙাদি ছুটলেন তরুবালাকে ধরে আনতে।

রঘু মাতব্বরের মতো এসে হাজির—এই যে হুটুদা, তাহলে আসতে পারলে?

একগাল হেসে হুটু জবাব দিল—আরে ভাই, এ তোমার

দেশোদ্ধারের ফুঁকো বক্তিমে ত নয়! দস্তুরমতো সাতাশ রকমের মিষ্টান্ন তৈরী—তাতে মেহনৎ লাগে, মগজ লাগে, বাপ-পিতেমোর আশীর্ব্বাদ লাগে। এই লোকজন নিয়ে এতখানা পথ আসাও এক মহিমারণ কাণ্ড।

বল্‌তে বল্‌তে মুটু হঠাৎ থেমে গিয়ে বলে—তা ভায়া এখানে দেখ্‌চি বেশ জমিয়ে ফেলেছ। কি ব্যাপার?

উচ্চাঙ্গের হাসি হেসে রঘুনাথ বল্‌লে—আছে, পরে হবে।

মুটুর লোকজন জিনিসপত্র একে একে এনে মেঝেতে নামাচ্ছে। হরগোবিন্দ বেরিয়ে যাচ্ছিলেন ঘর থেকে, দরজার মুখে তরুবালার সঙ্গে দেখা হতেই হেসে বল্‌লেন—এই যে পাগ্‌লী মা! যা ত্যাখ মিষ্টিটিষ্টি কেমন হলো।

তরুবালা ঘরে ঢুকেই শুন্‌তে পায় মুটু রঘুনাথকে বল্‌ছে—আর ব'ল না, কাজে [illegible] উড়ো ঝঞ্ঝাট। তোমার বন্ধু জগদীশ এক-গা জর নিয়ে এসে পড়ল।

রঘুনাথ চম্‌কে ওঠে—জগদীশ!

—হ্যাঁ হে, আমাদের সেই বড়বাবু, যে ছোকরা গাঁজা-চরস বেচে বেড়ায়। তা তার যা হাল, শুকিয়ে হল্‌দে পোকাটি হয়ে গেছে। এ যাত্রা বাঁচলে হয়।

রঘুনাথ প্রসঙ্গটা চাপা দেবার জন্য ব'লে ওঠে—এই যে দিদিমণি এসে পড়েছেন।

উৎসাহিত হয়ে মুটু-ময়রা তরুবালার দিকে এগিয়ে যায় দু হাত জোড় ক'রে—পেন্নাম দিদিমণি। আপনার পাকা দেখাতে মুটু হতভাগার পরীক্ষা। তারপর দি কুটুমবাড়ির লোকেরা খেয়ে

ভালো বলে তাহলে বিয়ের তাবৎ মিষ্টি কিন্তু আমি দেবো। তারপর কেমন আছেন ?

তরুবালার মুখে আঁধার নেমেছে। তার কানে আর কোনো কথাই যাচ্ছে না। হুটু একটু থামতেই তরুবালা উদ্বিগ্ন কণ্ঠে প্রশ্ন করে—তুমি কি যেন বল্‌ছিলে, বড়বাবু জগদীশ—তার কি হয়েছে ?

—ওসব বাউণ্ডুলে লোকের কথা বাদ দিন্ দিদিমণি। কে বল্‌বে যে অতবড় ঘরের ছেলে।

—কি হয়েছে তার তাই বলো না !

—হবে আবার কী, কাল জ্বরে ধরেছে। পড়ে আছে দোকানের মধ্যেই। এককালে ত ওর পিতেমোদের অনেক নূন পেটে গিয়েছে আমার বাপ-পিতোমার, তা বলি আছে থাক।

তরুবালা বললে—তোমার দোকানেই পড়ে আছে ? চিকিৎসাপত্র ?

—কে করবে, পয়সা কোথায় !

আর কোনো কথা না বলে তরুবালা ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। হুটুময়রা বিমর্ষ মুখে রঘুর দিকে তাকালো। রঘু তাকালো রাঙাদির দিকে। কিন্তু রাঙাদি তখন মিষ্টান্নাদি গোছগাছের তদারকে ব্যস্ত।

॥ কুড়ি ॥

মানুষের মন সময় বিশেষে দুনিয়ার সব কিছুকে অগ্রাহ্য ক'রে, অগ্রপশ্চাৎ পরিণাম সব কিছু ভুলে গিয়ে আপন লক্ষ্যপথে ধেয়ে চলে।

হুটুর মুখের কথা শেষ হবার পর পাঁচ মিনিটও কাটে নি, চৌধুরী বাড়ির একখানা মোটর সশব্দে গর্জন ক'রে দেউড়ি থেকে বেরিয়ে গেল। তরুবালা একা গাড়ি চালিয়ে যাচ্ছে—দরোয়ান চমকে উঠে সেলাম জানালো। পিছনে পড়ে রইল তরুবালার পাকাদেখার সমারোহ, সামাজিক আচার আচরণি-খচিত আয়োজন। তরুবালা ভ্রূক্ষেপ করবে না, তার হাতে সে সময় কোথায়! জগদীশ মৃত্যুমুখী, তার কেউ নেই দেখবার, সে ময়রার দোকানে অবহেলিত অবস্থায় পড়ে ধুঁকছে যে! তরুবালার কাছে এখন আর সবই তুচ্ছ।...গাড়ির বেগ মিনিটে মিনিটে বেড়ে চলেছে। সাঁই-সাঁই ক'রে অন্য গাড়িগুলোকে পিছনে ফেলে রেখে তরুবালা হাওয়ার আগে ছুটে চলেছে। মনের মতো দ্রুতগতি পেত যদি এই যন্ত্র তাহলে যন্ত্রনার হাত থেকে তরুবালা অনেক আগেই মুক্তি পেতে পারতো। কিন্তু তা হয় কই, পৃথিবীর মানুষের দক্ষতা বড় কম। নইলে সময় আর স্থানের ব্যবধানকে কেন সে ডিঙোতে পারল না।

সাধারণ আর পাঁচটা মিষ্টির দোকানের মতই সংকীর্ণ আয়তন মুটুর দোকানের। তবে নামডাক থাকার ফলে খরিদ্দারের ভিড় বড় বেশি। হঠাৎ মুটুর দোকানের সামনে চক্‌চকে ঝক্‌ঝকে মোটর গাড়ি থামতে সবাই চম্‌কে তাকালো। কৌতুহলী দৃষ্টিকে আরও চমৎকৃত করল তরুবালার সুশ্রী চেহারা। গাড়ির দরজা খুলে বেরিয়ে ও যখন মিষ্টির দোকানে ঢুকে পড়ল তখন কারিগর, চাকর সবাই তটস্থ হয়ে ছুটে এল। কিন্তু তাদের বিস্ময় বিহ্বলতার আধিক্য বশতঃ মুখ দিয়ে কথা বেরুচ্ছে না।

ব্যস্তভাবে তরুবালা প্রশ্ন করে—বড়বাবু কই, জগদীশ কোথায়?

চটপটে চাকর ভণ্টি বললে—ওই যে ওই কোণে!

ভণ্টির দৃষ্টি অনুসরণ ক'রে তরুবালা ছু'টে গেল জগদীশের কাছে। রাগীর উপর আলুথালু হয়ে ঝুঁকে পড়ে তরুবালা রুদ্ধকণ্ঠে ডাকে—জগদীশ, জগদীশ!

কোনো সাড়া নেই। রোগী জ্বরে বেহুঁশ। চোখ মেলে তাকালো না পর্যন্ত সে।

আকুলভাবে তরুবালা জগদীশের কপালে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বলে—জগদীশ! আমি এসেছি! আমি তরুবালা…

তবু কোনো সাড়া পাওয়া গেল না।

ব্যগ্রভাবে তরুবালা মুখ তুলে তাকাতেই দেখল চাকর বাকরেরা আশপাশে ভিড় জমিয়েছে। ভণ্টির চোখে চোখ পড়তেই তরুবালা অনুনয়ের স্বরে বললে—তুমি ভাই একটু সাহায্য করো না। এঁকে গাড়িতে তুলে দাও কোনোরকমে—

সবাই অবাক! এইরকম একটি সম্ভ্রান্ত ঘরের মেয়ে জগদীশকে

এখান থেকে নিয়ে যেতে চায়! কিন্তু তরুবালার চেহারায়, কণ্ঠস্বরে, হাবেভাবে বেশ পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে, সে জগদীশকে নিয়ে যাবার জন্যই এখানে এসেছে। উৎসাহী সাহায্যকারীর অভাব হ'ল না। মিনিট কয়েকের মধ্যেই তরুবালা গাড়ির স্টিয়ারিং ধরে বসল। এবং তরুবালার কাঁধের ওপর জগদীশের মাথাটা রেখে, তাকে আধশোয়া অবস্থায় নিয়ে তরুবালা গাড়িতে স্টার্ট দিল। কি করবে! এছাড়া অন্য উপায় নেই, জগদীশ বেহুঁশ, এ অবস্থায় কখন কি হয় বলা যায় না—পিছনের সীটে তাকে শুইয়ে রেখে তরুবালা উদ্বিগ্ন মন নিয়ে গাড়ি চালাতে পারবে না। অসম্ভব। একবার চোখমেলে তাকিয়েছিল জগদীশ, কিন্তু পরক্ষণে আবার চোখ বুজেছে। গাড়ি ছেড়ে দিল, কৌতূহলী দর্শকেরা আবার নিজের নিজের কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

গাড়ি ক্রমে থামলো হাসপাতালের সামনে। কয়েক মিনিটের মধ্যে জগদীশের জন্য একটা কেবিনের বন্দোবস্ত করে ফেলল্ তরুবালা। কিন্তু ডাক্তার এসে না দেখা পর্যন্ত ওর মনে এতটুকু স্বস্তি নেই। জ্বরে গা পুড়ে যাচ্ছে রোগীর। ত্বরিতে নার্সকে দিয়ে ডাক্তারের কাছে স্পেশাল কলবুক মারফৎ খবর পাঠানো হ'ল। এখন প্রতিটি সেকেণ্ড, তরুবালার মনে হচ্ছে যেন এক একটা যুগ।

ডাক্তার আসতেও মোটেই দেরি হয় না। বাইরে তাঁর জুতোর আওয়াজ পেয়ে তরুবালা মাথায় ঘোমটা টেনে দিল। গম্ভীর

ভাবে ডাক্তার ঘরে ঢুকে রোগীর কাছে এসে দাঁড়ালেন। কিছুক্ষণ ধরে তিনি নানাভাবে রোগীকে পরীক্ষা করলেন।

নতমুখী তরুবালা সবকিছুই উদ্‌গ্রীব হয়ে লক্ষ্য ক'রে, তবে এখন ও যেন নিজের অজ্ঞাতেই দায়িত্বের স্থৈর্যে নিজেকে বসিয়ে দেখবার চেষ্টা করছে এরই মধ্যে।

নার্সের হাতে প্রেস্‌ক্রিপ্‌শন দিয়ে, রিপোর্ট লিখে ডাক্তার চলে যাবার আগে অবগুণ্ঠনবতী তরুবালাকে লক্ষ্য ক'রে বল্‌লেন—এর নিউমোনিয়া!

মৃত্বস্বরে তরুবালা প্রশ্ন করে—কেমন বুঝছেন?

—দিন তিনেক না গেলে বলা শক্ত। ওর জ্ঞান নেই। আপন লোক একজন কাছে থাকলে ভালো হয়।

ডাক্তার চলে যেতেই তরুবালা ঘোমটা ফেলে দিল!

কৌতূহলী নার্স এবার তরুবালাকে প্রশ্ন করে—ইনি আপনার কেউ হন?

এতক্ষণ পরে ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে পড়ল তরুবালার, ও ঝর ঝর ক'রে কেঁদে ফেল্‌ল।

নার্স একটু বিব্রত হয়ে সান্ত্বনার স্বরে বলে—অসুখ করেছে, সেরে উঠবেন! আপনি অত ভেঙে পড়লে চল্‌বে কেন?

—না, ভেঙে পড়িনি ত!

চোখ মুছতে মুছতে তরুবালা বললে।

নার্সের দিকে তাকিয়ে তরুবালা মিনতিকরুণ মুখে বলে—শক্ত না হ'লে কি ওঁকে এখানে আনতে পারতাম ভাই! কিন্তু আমার এখন ভাবনা হয়েছে, এ অবস্থায় একা ফেলে রেখে থাকব কি ক'রে!

তরুবালার মুখের দিকে তাকিয়ে নার্সের নজর পড়ে ওর সিঁদুরহীন সিঁথির দিকে। মনে মনে সে হাসে। কিন্তু মুখের ভাবে এসব প্রকাশ করা চলে না। জীবনের বহু বিচিত্র দিক ওদের অভিজ্ঞতার দপ্তরে জমা রয়েছে। কাজেই বিস্মিত হ'ল না। প্রশ্ন করল না নার্স। শুধু বললে—আমি ত রইলামই। নিউমোনিয়া এমন কিছু মারাত্মক অসুখ নয়। আপনি নির্ভাবনায় থাকুন।

দীর্ঘনিশ্বাস। কিন্তু তার সঙ্গে বুঝি বা কিছু স্বস্তির আভাস মিশোনো রয়েছে তরুবালার এই নিশ্বাসে। পৃথিবীতে অন্ততঃ একজন মানুষ ও দেখতে পেয়েছে যে, এই চরম দুঃসময়ে সহায়-ভরসার অভয়বাণী নিয়ে পাশে এসে দাঁড়িয়েছে।

বাইরের দিকে তাকিয়ে তরুবালার বুক কেঁপে উঠল। এতক্ষণ বাদে হঠাৎ চৌধুরী বাড়ির মেয়ে তরুবালা—এই কথাটা মনে পড়ল। যে অনূঢ়া কন্যাকে কেন্দ্র করে অনেকগুলি মানুষের আশাস্বপ্ন প্রতীক্ষা করছে, যার জন্য জলের মত অর্থব্যয় করে চলেছেন ধনী জমিদার হরগোবিন্দ চৌধুরী, যে তরুবালার অনুপস্থিতিতে আজ চৌধুরী পরিবারের উত্তুঙ্গ মানমর্যাদা ধুলোয় গড়াগড়ি যাবে—সেই তরুবালা যেন হঠাৎ মানবী-প্রেয়সী তরুবালার প্রতি অগ্নি-ভ্রূ দৃষ্টিতে তাকায়। তরুবালা আস্তে আস্তে উঠে পড়ল। বাড়ি তাকে ফিরে যেতে হবে, টাকার দরকার—জগদীশকে বাঁচাতে হ'লে অনেক টাকা চাই। আর সে টাকার ব্যবস্থা তরুবালাকেই করতে হবে। তরুবালা নার্সের দিকে তাকিয়ে বললে—আপনার ওপর ভরসা ক'রে যাচ্ছি দিদি। দেখবেন। আমি অবিশ্যি চেষ্টা করব রাত্রে ফিরতে। আর এই টাকা রাখুন। ওষুধপত্র দরকার মতো আনিয়ে

করবেন। আর যদি বোঝেন, বড় ডাক্তারকে খবর দিতে হবে, তাই নেবেন।

নার্স হেসে বললে—না, না, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। আমি ঠিক আছি।

নার্সের হাত ধরে তরুবালা কাঁদো কাঁদো স্বরে বলে - আপনার বোন মনে ক'রে বাঁচান দিদি! আমার আপন বল্‌তে যা, তাই রেখে যাচ্ছি আপনার ওপর ভরসা করে।

আবেগের হাওয়া বুঝিবা পার্শ্ববর্তিনীকেও প্রভাবিত করে। কথা বলতে গিয়ে নার্সের কণ্ঠস্বরও গাঢ় হয়ে আসে। সে আন্তরিক স্বরে বলে—আচ্ছা বোন, তাই মনে রাখবো। তোমার কোনো ভাবনা নেই। তুমি বল্‌লাম বলে মনে করো না কিছু। সত্যি আমারও নিজের বোন ছিল না এতদিন, আজ তুমি সেই অভাব ঘোচালে। কি নাম ভাই তোমার!

তরুবালা বললে—সবই বলব তবে এখন আর সময় নেই দিদি। আমাকে এক্ষুনি যেতে হবে, আমার বোনের আজ পাকা দেখা।

রহস্যময়ী তরুবালার চোখের দিকে নার্স বিভ্রান্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। যাবার আগে তরুবালা আর একবার জগদীশের কপালের ওপর নিজের নরম গাল রেখে জ্বর পরীক্ষা করল, তারপর আঁধার মুখে জোর ক'রে নিজেকে ছিঁড়ে নিয়ে বেরিয়ে গেল।

চৌধুরী বাড়ির দেউড়িতে যখন তরুবালার গাড়ি ঢুকল তখন সন্ধ্যা নেমেছে।

ত্রস্তব্যস্ত লোকজন তরুবালাকে দেখে সসম্ভ্রমে পথ ছেড়ে সরে দাঁড়ায়। কি জানি, বড়লোকের বড় ব্যাপার—ওসব নিয়ে সবাই মাথা ঘামালে মাথাটারই নাকাল। অতএব আদরিনী তরুবালা বিনা বাধায় গাড়ি থেকে নেমে খিড়কী দরজা দিয়ে অন্দরে ঢুকল।

কিন্তু বাধা পেল সিঁড়ির মুখে। হরগোবিন্দ পাষাণ কঠিন মুখে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। তরুবালা সিঁড়িতে পা দিয়ে পিতার মুখের পানে তাকালো—কিছু বলছ, বাবা!

হরগোবিন্দর গম্ভীর প্রশ্ন—কোথায় গিয়েছিলে?

—বন্ধুর অসুখ, দেখতে গিয়েছিলাম বাবা!

—তা, আজই যেতে হ'ল, এদিকে কুটুম বাড়ির লোকজন বসে রয়েছে এসে!

তরুবালা আবেগকম্পিত, অভিমানাহত স্বরে বললে—অসুখে ত বাবা সুখের মত বসে থাকতে জানে না। আজ না গেলে, কাল হয়তো যাওয়ার আর দরকারই হ'ত না,—হয়তো কোনদিনই আর হ'ত না।

নিমেষে হরগোবিন্দ মুখের গাম্ভীর্য ধুয়ে যায়। তিনি জানেন তাঁর মেয়ে ঠিক কথাই বলেছে। একটু অভিমানাহত কণ্ঠে তিনি বল্লেন—আমার ভুল হয়েছে মা। তুই এখন তৈরী হয়ে আয়। ওঁরা সব রয়েছেন!

সুরবালা নিকটেই ছিলেন। তরুবালা সিঁড়ি দিয়ে উঠে যেতেই রাঙাদিকে তিনি বল্লেন—দেখলে ত শাসনের নমুনা! এই ক'রে উনি সোমত্থ মেয়ের রাশ সামলাতে পারবেন—হুঁ! আদর দিয়ে দিয়ে মাথাটি খেয়ে বসেছেন।

কথাগুলো হরগোবিন্দর কানে ঠিক পৌঁছয় কিন্তু তিনি মনে মনে হাসলেন, জবাব দিলেন না। সত্যিই ত তিনি তরুবালাকে চোখ রাঙিয়ে কথা কইতে পারেন না। মেয়েটার মুখে এমন সারল্য মাখোনো রয়েছে যে দেখলেই মায়া হয়—যেন ওর আর কেউ নেই!

॥ একুশ ॥

পাকা দেখা হয়ে গেছে। তরুবালা আপন নিয়মে দু-বেলা হাসপাতালে আসা-যাওয়া করে। তাকে ভরসা ক'রে কোনো কথা কেউ বলে না! কি-জানি কোন্ কথায় কি বিপত্তি ঘটে যায়, শেষে না ভরা-ডুবি হয়। বলা ত যায় না—যে মেয়ের চোখ ফুটেছে, মুখ ছুটেছে তার সামনে কে কী বল্‌বে। একমাত্র যাঁর বল্‌বার প্রয়োজন এবং সাহস রয়েছে, সেই হরগোবিন্দ চৌধুরী কেমন যেন উদাসীন! না, ঠিক তাও নয়—তিনি এতসব খোঁজ খবর রাখার ফুরসৎ পান না। তা ছাড়া বন্ধুর অসুখে বিচলিত হওয়া বা তাকে দেখতে যাওয়ার মধ্যে অন্যায় অশোভন কিছু থাকতে পারে ব'লে হরগোবিন্দ ঘুনাক্ষরেও অনুমান করতে পারেন না।

হাসপাতালের কেবিনে তরুবালার স্বচ্ছন্দ নিরুদ্বিগ্ন মুহূর্তগুলি কাটে। জগদীশ একটু একটু ক'রে রোগমুক্তির দিকে চলেছে। মাঝে মাঝে দুটো চারটে কথাও বলে, কখনও বা পাণ্ডুর চাঁদের মতো ঠোঁটের ওপরে এক টুক্‌রো হাসি খেলে যায়। তরুবালা আবেশমুগ্ধ, ওর দু-চোখের পত্রপল্লব কেঁপে যায়, অতিক্রান্ত বিভীষিকার ছায়াতঙ্কে কখনও বুক কেঁপে যায়—যদি জগদীশ না-বেঁচে উঠ্‌ত! না, না, তরুবালা এসব কথা ভাববে না।

তরুবালার মুখের ওপর নজর পড়ল জগদীশের—ঘুম ভেঙে সে ওকে দেখে হাসলো—

—তরুবালা!

—বলো।

—না, কিছু না।

—আচ্ছা।

তরুবালা থামল।

জগদীশের ঠোঁট নড়ে, খুব দুর্বল—তা দেখলেই বোঝা যায়।

তরুবালা সাগ্রহে বলে—এখন কোনো কথা নয়, তুমি আগে ভালো হয়ে ওঠো! তোমাকে ভালো হয়ে উঠতেই হবে জগদীশ—নইলে আমার বেঁচে থাকার কোনোই অর্থ নেই।

ম্লান হাসি হেসে জগদীশ চোখ বুজল।

কিছুক্ষণ পরে সে যখন আবার তাকালো তখনও আগের মতোই তরুবালা উদ্‌গ্রীব একাগ্রতায় তন্ময় হয়ে তাকিয়ে রয়েছে। জগদীশ তরুবালাকে চোখের ইসারায় কাছে সরে বসতে বলে। তরুবালা তার হাতের ওপর হাত বুলিয়ে দিতে শুরু করল।

জগদীশ বললে—হয়ত অসুখ করেছে···কিন্তু,—কিন্তু

হাঁপিয়ে পড়ল এইটুকুতেই সে। কথা বলার পরিশ্রমে নয়—তার মনের দরজা ঠেলে রাশি-রাশি কথার ঝাঁক যেন একই মুহূর্তে বেরিয়ে আসতে চাইছে। সে কিছুতেই নিজেকে সামলে রাখতে পারছে না যেন।

—আমার সমস্ত জীবনটাই অন্যায়ের বোঝা···তারই ভারে মুখ থুব্‌ড়ে পড়েছি! তুমি, তুমি আমায় বাঁচালে! তরু তুমি

চিন্‌তে ভুল করো নি—ঠিক চিনেছ। এমন ক'রে কেউ কাউকে কোনোদিন চেনে নি। ভালোবাসা দিয়েই তুমি চিন্‌লে।

তরুবালা চুপ ক'রে বসে শোনে। এতটুকু, এক পলকের জন্যও ওর দৃষ্টি জগদীশকে চোখের আড়াল করতে পারে না। জগদীশ তরুবালার ডান হাতখানা নিজের শীর্ণ মুঠিতে ধরে কি যেন বল্‌তে গিয়েও বল্‌তে পারল না। ক্লান্তিতে, তৃপ্তির অবসাদে তার চোখ বুজে আসে। অল্পক্ষণের মধ্যে জগদীশ আবার ঘুমিয়ে পড়ল।

তরুবালা আপন মনে নিজেকে বলে,—না, ঠিক হচ্ছে না। এভাবে আর চল্‌বে না, চল্‌তে পারে না। দু নৌকোয় ভরসা করে আর ক'দিনই বা চল্‌বে?—কিন্তু কি করবে তরুবালা? উপায় খুঁজে পাচ্ছে না। ওর বাড়ির লোকেরা বিয়ের বন্দোবস্ত পাকা পোক্ত ক'রে তুল্‌ছে। আর তরুবালা নিজে বিপরীত দিকে চলছে এগিয়ে।

জগদীশকে কোথায় ফেল্‌বে তরুবালা? তবে কি ভেসে পড়বে নিজের ওপর ভরসা ক'রে? ব্যাপার যেরকম গড়াচ্ছে তাতে সেটাই স্বাভাবিক পথ। যা স্বাভাবিক তাই ঘটুক না! মাঝখান থেকে এখন গোলমাল ক'রে কাজ কী! হয়তো তরুবালা ইচ্ছে করলেই সাহসে বুক বেঁধে বাপের কাছে নিজের মতবদলের কথা জানিয়ে দিতে পারে। কিন্তু সে কথা শোনবার পর বংশমর্যাদার ধ্বজাধারী হরগোবিন্দ কন্যাকে নিজের গৃহে স্থান দেবেন না। জগদীশের অসুখ কমলেও, সারতে এখনও সময় লাগবে। এ অবস্থায় জগদীশকে উত্যক্ত করলে হয়তো তার অসুখ বেড়েই যাবে। তার চেয়ে থাক

না, আর ক'টা দিন কাটিয়ে দিয়ে তরুবালা জগদীশকে সব বল্‌বে, হরগোবিন্দকেও জানাবে।

জগদীশের কপালের ওপর আলতো ভাবে নিজের হাত রেখে তরুবালা জানলা দিয়ে ছাদের দিকে তাকিয়ে ভাবছিল। আকাশের বুকে হাল্কা মেঘ জমে উঠছে। এর পর হয়তো ওই মেঘই ঘনিয়ে ডেকে আনবে বর্ষার বৃষ্টিকে।

একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল তরুবালা। হঠাৎ সাড়া পেল গম্ভীর গলায় ডাক্তার বল্‌ছেন—আসতে পারি ?

ব্যস্ত ভাবে উঠে বসে তরুবালা ঘোমটা টেনে, মৃদু কণ্ঠে বলে—আসুন !

তরুবালা মুখ নত করে থাকে। ডাক্তার আপন কাজগুলি একের পর এক করে যান। চার্ট মিলিয়ে খুশির আনন্দে তিনি বল্‌লেন, যেন দেয়ালকে উদ্দেশ করেই—এখন ওঁকে ঘুমের ওষুধ দেওয়া হয়েছে। আপনি ভাববেন না, আর দু-চার দিনের মধ্যেই উনি ছাড়া পাবেন।

একথা শুনে তরুবালার অবগুণ্ঠন সরে যায় নিমেষের জন্য। কিন্তু কি দেখে ও হঠাৎ চম্‌কে উঠ্‌ল। ডাক্তারের মুখখানা যেন খুব পরিচিত। হোক পরিচিত, কিছু যায় আসে না। তরুবালা ত নিজের পথ ঠিক করে ফেলেছে। তবে আর এত ভাবনা কিসের। কিন্তু নিজের প্রতিবাদ সত্ত্বেও ঘোমটা টেনে মুখ নীচু ক'রে বসল।

হাঁসপাতালের মেঝেতে খট্‌-খট্‌ শব্দ তুলে ডাক্তার বিদায় নিলেন।

এমনি ভাবেই কয়েকটা দিন কেটে গেল।

জগদীশ আরামের নরম বিছানায় শুয়ে শুয়ে আকাশ পাতাল কতো কি যে ভাবে তার ঠিক-ঠিকানা নেই। শরীরের নিরাময়তা ফিরে আসার সঙ্গে সঙ্গে তার আত্মপ্রত্যয় ফিরে আসে। জীবন-সমালোচনার একটা নৈর্ব্যক্তিক দৃষ্টি সে হঠাৎ যেন কুড়িয়ে পায় এই হাঁসপাতালের আবহাওয়াতে।

একদা প্রভাতে ঘুম ভেঙে উঠে বসে জগদীশের মনে হ'ল, ঘরখানা বড়ই শূন্য। তরুবালা নেই, তরুবালার মিষ্টি কথার ধ্বনি কানে বাজছে না, ওর মধুর-কোমল হাসি ভাসছে না জগদীশের চোখের সামনে। দীর্ঘনিশ্বাসটুকু নিজের বুকের মধ্যে আটকে রেখে জগদীশ বললে নিজেকে—এ তুমি কি করছ? এ কোথায় চলেছ জগদীশ? না, না, এ ঠিক হচ্ছে না। তরুবালাকে সে কোথায় টেনে নিয়ে চলেছে। তরুবালা তাকে ভালোবাসে। আর জগদীশ—? হ্যাঁ। জগদীশও তরুবালাকে ভালোবাসে। কোনো ভুল নেই। আর সেইজন্যেই জগদীশকে চলে যেতে হবে। সে চলে যাবে,—যত কষ্টই হোক তাকে যেতে হবে! নতুবা তরুবালার পরিত্রাণ নেই। তরুবালাকে ভালোবাসে বলেই জগদীশ তার প্রেমের স্বপ্নকে পৃথিবীর ধুলোতে লুটোতে দেবে না। তরুবালাকে সে বাঁচাবে। অকর্মণ্য, অন্তঃসারশূন্য একটা যাযাবরের হাত থেকে তরুবালাকে মুক্ত করবে জগদীশ। নতুবা তরুবালার জীবন যে বিষময় হয়ে উঠবে!

নার্সকে ডাকলো জগদীশ। নার্স এসে দাঁড়াতেই সে বললে—আমি যাবো!

বিস্মিত হয়ে ন্যার্স প্রশ্ন করে—সে কি? হঠাৎ!

—হঠাৎ নয়। আমাকে যেতে হবে।

গম্ভীরভাবে নার্স বললে—এ ভাবে ত আপনাকে ছাড়তে পারি না। উনি আসুন—

জগদীশ হেসে উঠল—এই না হ'লে মেয়েছেলে বলেছে! উনি আসবেন—না! আপনি আছেন কি করতে? আমি কি কচি খোকা? চল্‌লাম, নমস্কার। ধন্যবাদ।

ব'লে জগদীশ নতুন শ্লিপারে পা গলিয়ে দরজার দিকে এগিয়ে যায়।

নার্স অত্যন্ত বিপন্ন, বিব্রত ভাবে বলে—এইভাবে আপনি আমার চাকরী খাবেন? আর মিনিট পাঁচেক সবুর করতে পারেন না?

জগদীশ ঘাড় ফিরিয়ে বলে—পাঁচ মিনিট, ঠিক ত! তাহলে কি হবে?

—আপনি বসুন, আমি একখানা ডি. আর. বি. ফর্ম নিয়ে আসি চট্ ক'রে।

—সে আবার কি? তরুবালাকে টেলিফোন করবেন না ত?

নার্স তাচ্ছিল্যভরে উত্তর দিল—তরুবালা, মরুমায়া আপনাদের জন্যে। আমাদের জন্যে চাকরী। এই যে আপনি হঠাৎ চলে যাচ্ছেন, তা কৈফিয়ৎ দিতে হবে ত আমাকে। সেই জন্যে ফর্ম আনিয়ে আপনাকে দিয়ে সই করিয়ে নিতে হবে। আপনাকে বল্‌তে হবে, 'আমি স্বেচ্ছায় নিজের দায়িত্বে হাসপাতাল ছেড়ে যাচ্ছি। এরপর আমার ভালোমন্দ হ'লে তার জন্যে আমি কাউকে দায়ী করব না।'

জগদীশ ব্যস্তভাবে বলে—আমার মোটে সময় নেই। নিয়ে আসুন আপনার ফর্ম। এখুনি।

ফর্মে সই ক'রে জগদীশ কলম ফেরত দিতেই নার্স কৌতূহলী হয়ে বলে—তা হঠাৎ আপনি চললেন কোথায়?

রহস্যময় কণ্ঠে জবাব দিল জগদীশ—পালিয়ে যাচ্ছি।

—কেন?

—ভয়ে।

—পুলিশের?

—না, নিজের। আমার যতো ভয় নিজেকে।

—আর আপনার স্ত্রী!

—স্ত্রী!

জগদীশ চমকে ওঠে। পুনরায় সে নার্সের মুখের পানে চেয়ে একটু হেসে বললে—ভুল। ও আমার বান্ধবী, মানে, আমি ওর কেউ নই। তাই—। আচ্ছা নমস্কার—

—নমস্কার।

জগদীশ চৌকাঠ পেরিয়ে বেরিয়ে গিয়ে আবার ফিরে এলো। নার্সের হাতে একখানা একশ টাকার নোট দিয়ে বললে—বকশিশ নয়, নমস্কারী! আপনি আমার জন্যে অনেক করেছেন।

গায়েহলুদের পর বাড়ি থেকে আইবুড়ো মেয়েকে বেরুতে নেই। কিন্তু তরুবালাকে আটকে রাখতে পারে না কেউ। হলদে সুতো বাঁধা হাতখানা নিজের চোখের সামনে তুলে ধ'রে তরুবালা একটু

হাসলো। ঠিকই হয়েছে, তরুবালা ত বিয়ে করতেই চলেছে। তবে পাত্র আছে ওই হাসপাতালের কেবিনে। এক-গা গহনা রয়েছে তরুবালার সঙ্গে। আর, আরও আছে অনেক টাকা গাড়িতে। ব্যবস্থা মোটামুটি করে নিয়েছে তরুবালা।

হরগোবিন্দ এসে বললেন—পাগ্‌লী, আজ আর না বেরুলেই ভালো করতিস।

মাটির পানে চেয়ে তরুবালা বলে—এই আজই ত শেষ বেরুনো বাবা! আর ত কিছু চাইবো না তোমার কাছে। আজকের দিনটা আর আপত্তি ক'র না।

দীর্ঘনিশ্বাস পড়ল। হরগোবিন্দ মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন—যা ভালো বোঝো করো। পাঁচজনে ব'লছে কিনা—

—পাঁচজনের কথাই সব? বাবা, তোমার কাছে আমার কথা কিছু নয়?

হাসলেন হরগোবিন্দ—পাগলী! অমনি অভিমান হ'ল। আচ্ছা যা—কিন্তু বেশি দেরি করিস নে!

তর-তর ক'রে সিঁড়ি বেয়ে চৌধুরী বাড়ি থেকে তরুবালার নেমে যাওয়া আর ওর হাসপাতালের সিঁড়ি দিয়ে চট্‌পট্ উঠে পড়ার মধ্যে যেন কোনো ছেদ, ব্যবধান নেই। সারা পথটা ও রুদ্ধশ্বাসে ভাবনার ডানায় ভর ক'রে উড়ে এসেছে যেন।

কিন্তু তারপর?

তারপর সব শূন্য। জগদীশের বিছানাটা খালি দেখে তরুবালার বুকের মধ্যে ধড়াস্ ক'রে ওঠে। নার্সকে ডাকলো।

নার্স এসে বললে—কি ব্যাপার?

তরুবালা প্রশ্নটা ফিরিয়ে নিল—ব্যাপার কী?

—তিনি চলে গেছেন।

—কোথায়?

—জানিনে ত!

—কি বলে গেছেন?

—কিছু না।

—কিছুই বলে যাননি?

এ কথার জবাবে নার্স কোনো কথা বলে না।

তরুবালা ঘরখানার অসীম শূন্যতায় যেন হাঁপিয়ে ওঠে। জগদীশ চলে গেছে! (বিশ্বের জনসমুদ্রে সে নিজেকে হারিয়ে দিয়েছে। তরুবালার জন্য কোনো ঠিকানা সে রেখে যায় নি।)

নার্সের বিভ্রান্ত দৃষ্টির সামনে দিয়ে তরুবালা ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল।

ডাক্তার বোধহয় এই দিকেই আসছিলেন রোগীর খবর নিতে। তরুবালাকে দেখে থমকে দাঁড়ালেন। তাঁর নজর পড়েছে তরুবালার হাতে হলুদ সুতোবাঁধা চুড়ের দিকে। দৃষ্টি তাঁর হাত থেকে মুখের ওপর ন্যস্ত হয়।

ডাক্তারেরও আজ গায়েহলুদ হয়েছে। তাই সকালের দিকে তিনি আসতে পারেন নি। ছুটি নিয়েছেন হাসপাতাল থেকে। কিন্তু জগদীশের 'কেস্'টা তিনি খুব যত্ন নিয়ে দেখছেন ব'লেই একবার এসেছেন খবর নিতে।

কিন্তু একি হ'ল! এ মেয়েটি কে? মেয়েটি রোগীর কে? ডাক্তার কিছু বুঝতে পারেন না। অথবা বুঝতে ইচ্ছে করছে না তাঁর।

তরুবালা তাঁর সামনে দিয়ে বেরিয়ে গেল। কোনো দিকে ভ্রূক্ষেপ নেই ওর।

নার্সের কাছে তিনি খবর নিয়ে জানলেন রোগী চলে গেছে নিজের দায়িত্ব নিয়ে আজ সকালেই।

সব শুনে তিনি বললেন—আচ্ছা!

তরুবালা গাড়ি নিয়ে এখানে ওখানে যেখানে সেখানে জগদীশের খোঁজ করে বেড়ালো পাগলের মত। না, কোথাও জগদীশ নেই। সে তার পুরনো সবগুলি আড্ডা পরিহার করেছে। সে নিরুদ্দেশ।

অবশেষে ক্লান্ত, অবসন্ন, রিক্ত মনে তরুবালা ফিরে এল চৌধুরী বাড়িতে।

গাড়ি থেকে নেমে স্খলিতপদে চল্‌তে গিয়ে ও মঙ্গলঘটে ঠোক্কর খেয়ে পড়ে যেতে যেতে টাল সামলালে। ঘটটা কাৎ হয়ে পড়ল, জলে মেঝেটা ভেসে গেল।

॥ বাইশ ॥

জগদীশ জানতো তরুবালার বিয়ের তারিখ। হুটু ময়রার দোকানেই সে সব খবর পেয়েছিল অসুখের প্রথম মুখে। তখনই মনে মনে সংকল্প করে রেখেছিল, বিয়ের দিন চৌধুরী বাড়িতে গিয়ে একছড়া মুক্তোর নেক্‌লেস্‌ উপহার দিয়ে আসবে। মাঝখান থেকে অসুখ, হাসপাতাল, তরুবালার অকৃপণ সেবা—সবকিছুতে মিলিয়ে যেন একটা জটিল সমস্যাজাল ছড়িয়ে ফেলেছিল। সুস্থতা ফিরে আসার সঙ্গে সঙ্গে সে আবার একটু একটু ক'রে মনের বল ফিরে পাচ্ছিল।

আচম্‌কা চলে আসা ছাড়া তার অন্য পথ খোলা ছিল না। এইভাবে পালিয়ে না এলে সে কিছুতেই আসতে পারতো না। তবু মনের সেই পুরনো সাধটুকু একেবারে মুছে ফেল্‌তে পারে নি। যে মেয়ে জগদীশের জীবনের মর্মমূলে পুনরুজ্জীবনের অমূল্য অমৃত সিঞ্চন করেছে, তাকে সে কিছুই দেবে না? না, তা হয় না। জগদীশ আর ত কিছু দিতে পারে না। তরুবালা তার কাছে অমৃত মনে ক'রে যা চেয়েছে তা যে কি সাংঘাতিক বিষ একমাত্র জগদীশই বোঝে। না, সে কিছুতেই তরুবালাকে মাটির, কাদার সঙ্গে

মিশিয়ে দিতে পারবে না। ও যে পারিজাত ফুল। ওর স্থান নন্দনলোকে।

আজ তরুবালার বিয়ে।

জগদীশ নিজের সঞ্চিত অর্থ সংগ্রহ ক'রে কলকাতার সবচেয়ে বিখ্যাত মণিকারের দোকানে হাজির হ'ল। বেলা এখন সাড়ে চারটে।

সকাল থেকে শুরু হয়েছে নহবতের সুরবিস্তার।

চৌধুরী বাড়িতে আজ বিপুল সমারোহ। আমন্ত্রিত আত্মীয়-কুটুম্বের কলকণ্ঠে চারিদিকে সোরগোল।

তরুবালা কিন্তু নিজের ঘরে শুয়ে রয়েছে। কারুর সঙ্গে ও কোনো কথা বল্‌ছে না। ইদানীং ওর রহস্যজনক আচরণে অনেকে মনে মনে ক্ষুণ্ণ, কিন্তু মুখের ওপর কেউ সে কথা বলে না। আড়ালে-আবডালে নিজেদের মধ্যে অবশ্য এসব নিয়ে বিস্তর জল্পনা-কল্পনা চলে।

কাল রাত থেকে তরুবালা বিছানা ছেড়ে ওঠে নি। সুরবালা কথা বল্‌তে গিয়ে ধমক খেয়েছেন—আমি কচি খুকী নই। তোমরা তোমাদের কাজ করো না। মিছে কেন ঘাঁটাচ্ছ মা! বেশ আছি একা-একা!

ভোরবেলা দধিমঙ্গলের সময়ও তরুবালা দাঁতে কেটে খাবার ফেলে দিয়েছে। কান্নায়-কান্নায় ওর চোখ দুটো রাঙাজবার মত লাল হয়ে উঠেছে।

হরগোবিন্দ দু-চারবার এ ঘরে এসেছেন নিঃশব্দে, আবার পা-টিপে

টিপে বেরিয়ে গেছেন। তরুবালা হয়তো বাপ-মায়ের স্নেহের টান উপড়ে ফেলে দিয়ে চলে যেতে নারাজ, তাই এত কান্না ওর। থাক, চুপচাপ শুয়ে থাক। বিয়ের পর আবার সব ঠিক হয়ে যাবে। নেহাৎ ছেলেমানুষের মত নরম ওর মনটা, তাই বুঝি এত কাতর হয়ে পড়েছে তরুবালা—এই ভেবে হরগোবিন্দ নিজেকে সান্ত্বনা দেন।

এক সময়ে তরুবালা ঘুমিয়ে পড়েছিল।

ঘুমের মধ্যে আশ্চর্য এক স্বর্গস্বপ্নের সন্ধান রয়েছে, তা কে জানতো।...ও দেখল জগদীশ এসেছে। কণ্ঠে তার জুঁই ফুলের গোড়ে মালা। সৌরভে চারিদিক আমোদিত। চন্দনচর্চিত প্রশান্ত শুভ্র ললাটভূমিতে সৌকুমার্যের বিকাশ।

চোখের কোণ দিয়ে একটুখানি সে মুখখানি দেখে তরুবালা মধুর লজ্জায় দৃষ্টি নত করে। আবেগের অগ্নিবাষ্পে কাঁপছে ওর সর্বাঙ্গ।

চমকে উঠ্‌ল তরুবালা। ওর সুখস্বপ্ন টুটে গেল। অনুপমা, শোভা ওকে ঠেলে তুল্‌ল। কলকণ্ঠের উচ্ছলতায় ওরা যেন তরুবালার সমস্ত সত্তাকে পায়ে দলে মাড়িয়ে দিয়েছে। তরুবালা আর্তকণ্ঠে বলে ওঠে—কি হ'ল ?

শোভা মুখ টিপে হাসে, বলে—আর ত ভাই কতটুকু সময়, এর পরই সব হবে।

অনুপমা ললিত চপল কণ্ঠে গেয়ে ওঠে—তোমায় সাজাবো যতনে কুসুমে রতনে···

তরুবালা ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে বলে—আঃ কি হচ্ছে ? যাও আমার শরীর ভালো নেই।

পিছন থেকে দূর সম্পর্কের এক আত্মীয়া হেসে বললে—আহা,

ডাক্তাব ত আসছেই তখন অসুখ ভালো করে দেবে ভাই। এখন কষ্ট ক'রে একটু ওঠো—

শোভা বললে—আমরা তোমাকে সাজাবো।

তরুবালার কোনো কথায় কেউ কান দিল না। জোর ক'রে তুলে বসিয়ে দিল। মূক, মূঢ় তরুবালা পটে-আঁকা ছবির মতো বসে রইল। ও যেন বেঁচে নেই, ওর মৃত্যু হয়েছে। এরা সব সেই মৃতদেহ নিয়ে ছিনিমিনি খেল্‌ছে।

জগদীশ যখন আলোকমালা সজ্জিত চৌধুরী ভবনে ঢুকল তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। সে অসঙ্কোচে গাড়ি বারান্দার নীচে পৌঁছলো। চারিদিকে লোকজন থৈ-থৈ করছে। এক পাশে একটু-খানি দাঁড়িয়ে কি যেন ভেবে নিল জগদীশ। তারপর আস্তে আস্তে বাড়ির ভিতরে ঢুকে পড়ল। একবার ভাবলো কাউকে জিজ্ঞাসা করে জেনে নেবে তরুবালা কোথায়! আবার ভাবলো, কাকে জিজ্ঞাসা করবে, সে কি মনে করবে? এই ত বাড়ি, বাড়ির মধ্যেই তরুবালা রয়েছে। একটু খুঁজে নেওয়া এমন আর কি শক্ত ব্যাপার।

সম্মুখের সিঁড়ি দিয়ে সোজা দোতলায় উঠে জগদীশ একের-পর একখানা ঘরে উঁকি দিয়ে দেখতে শুরু করল। তরুবালা নেই। না, এ ঘরেও নয়! তবে?

এমন সময়ে তার সামনে এসে একজন জিজ্ঞাসা করল—কি চাই? কাকে খুঁজছেন?

জগদীশ কোনো কিছু উত্তর না দিয়ে নিজের মনে লোকটির পাশ

কাটিয়ে যেতে চায়। লোকটি পথ আগলে দাঁড়িয়ে বলে—কি, চুপচাপ সরে পড়বার মতলব নাকি ?

জগদীশ গম্ভীর ভাবে জবাব দিল—এ্যাঁ! না। আমি তরুবালাকে খুঁজছি।

লোকটি জগদীশের আপাদমস্তক বারকয়েক চোখ বুলিয়ে দেখে নিয়ে বলে—তরুবালাকে ? বলো কি হে!

জগদীশ ভ্রূক্ষেপ করল না। আবার যেতে চেষ্টা করে সে।

লোকটি ভ্রূকুঁচ্‌কে বললে—বুঝিছি, পাকা চোর। দাঁড়াও—

ব'লে সে হাঁক দিল—এই যে, ও ভাই কর্তাকে একবার খবর দাও তো।

এবার জগদীশ বিরক্ত হয়ে বলে—কি বাজে ঝামেলা করছেন মশাই। বল্‌ছি ত তরুবালার সঙ্গে আমার দরকার, তার বাবাকে খবর দিয়ে কি হবে।

—বটে! দেখি তোমার পকেট দেখি। কিছু হাতিয়েছ কিনা। আরে বাবা, এই শৰ্ম্মার চোখে ধুলো দিয়ে পালাবে ?

বলেই লোকটি জগদীশের পকেটে হাত দিতে উদ্যত হয়। জগদীশ পকেট চেপে ধরে বলে—আচ্ছা মুস্কিল ত! ছাড়ুন, খবরদার পকেটে হাত দেবেন না, ভালো হবে না।

এদিক ওদিক থেকে লোক জুটতে এতটুকু বিলম্ব হয় না। সবাই জগদীশকে ঘিরে ফেলেছে।

একজন বললে—কি ব্যাপার ?

দ্বিতীয় ব্যক্তি জবাব দেয়—বড় কাজের বাড়ি, চোর ত থাকে সন্ধানে!

তৃতীয় ব্যক্তি সোর গোল তুলে দিল—চোর চোর! জটাদা চোর ধরেছে।

মিনিট কয়েকের মধ্যে সারা বাড়িতে রব উঠল—চোর, চোর।

তরুবালা গোলমাল শুনে প্রশ্ন করে—কি হয়েছে?

একজন মহিলা বললেন—চোর ধরা পড়েছে। সে আবার স্বামনা চোর, বলে কি তরুবালার বন্ধু সে! ওমা আমার কি হবে!

তরুবালার বুকের মধ্যে ধড়াস ক'রে ওঠে—কেমন চোর!

ব্যস্ত ব্যগ্র তরুবালা সাজসজ্জা ফেলে উঠে পড়ল। ছুটতে ছুটতে ভেতরের বারান্দায় এসে দাঁড়ালো তরুবালা; ভীষণ ভিড়। কিছু দেখা যাচ্ছে না। হরগোবিন্দ মেয়েকে দেখে বললেন—তুই এখানে কেন মা?

—কি হয়েছে বাবা? কাকে ধরেছে ওরা?

—চোর। মুক্তোর নেক্‌লেশ নিয়ে পালাচ্ছিল।

—না, না, ওরা যে বল্‌ল সে আমার খোঁজ করছিল!

—পাগলামী রাখ, তরু!

—না বাবা, আমি তাকে দেখবো। ওরা যদি তাকে ধরে থাকে।

—তাকে? কাকে? শোন্ এদিকে আয় তরু।

—না যাবো না। ওরা নিশ্চয় তাকে ধরেছে।

হরগোবিন্দ মেয়ের হাত ধরে নিজের ঘরে টেনে নিয়ে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দিলেন। তরুবালা পিতার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে।

তরুবালা উদ্ধতভঙ্গীতে বলে—তোমরা আমাকে এখানে টেনে আনলে কেন বাবা?

হরগোবিন্দ শান্ত অনুতপ্ত স্বরে বলেন—অনেক হয়েছে আর নয় তরু।

—আমাকে যেতে দাও, দেখতে দাও কা'কে তোমরা চোর ব'লে ধরেছ!

—না।

—কেন?

—তা হয় না, তরু! আমি তা হতে দিতে পারি না। আমাদের এ পরিবারে অশুচিতা নেই, কোনো লজ্জার ইতিহাস নেই, চৌধুরী বংশের চিরকালের গৌরব মুকুট তুই কি চাস ধূলোয় লুটিয়ে যাক! তুই কি চাস তোর এই বাবা, মা সবাই দুনিয়ার চোখে স্বৈরিণীর জনক জননী হবার কলঙ্ক মুখে মেখে ঘুরে বেড়াবে।

—হঠাৎ এসব কথা কেন বল্‌ছ বাবা?

—আমি ত কিছুই বল্‌তে চাইনি মা! তোকে মনের মতো করে লেখাপড়া শিখিয়ে মানুষ গড়তে গিয়ে কি ভুল করেছি? আমার আদর যত্নের কোনো মূল্যই কি তুই দিবি নে?

—দেবো বাবা, ক্ষমতা থাকলে দেবো। প্রাণ দিয়ে যদি তার কণামাত্র শোধ চাও তাই দেবো। কিন্তু এসব বলছ কেন বাবা?

উত্তেজিত হরগোবিন্দ ঘরময় পায়চারি করছেন—যেন পিঞ্জরাবদ্ধ সিংহ। তিনি মেয়ের দিকে তাকিয়ে বললেন—বল্‌ছি। তবে শোন্, ও হোলো জগদীশ চক্রবর্তী!

—কে? জগদীশ এসেছে? তাকে তোমরা—?

মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে হরগোবিন্দ বলেন—সে তোকে চেনে ব'লে দাবি করছে। পাঁচশো লোক জমেছে। তাদের চোখের

সামনে প্রমাণ হয়েছে যে সে লোকটা চোর। তবু দু-পাঁচজনে বল্‌ছে, বেশ ত আপনার মেয়ে এসে দেখুক না, তাহলেই ল্যাঠা চুকে যায়। বুঝলি মা, জ্ঞাতিশত্রু! তারা কেবল ছিদ্র খুঁজে বেড়ায়।

তরুবালা বিকারগ্রস্তভাবে বলে—কিন্তু এসব কেন বল্‌ছ বাবা? আমি যে তাকে চিনি, খুব ভালো ক'রে চিনি, বাবা! তাকে যেমনটি আমি চিনি তেমনটি আর কেউ চেনে না।

হরগোবিন্দ দু-চোখ মেলে থেকেও যেন গভীর অন্ধকারে হারিয়ে যাচ্ছেন। তিনি স্খলিত কণ্ঠে বলেন—না, না, না,—সে হয় না তরু মা! তুই আমার মেয়ে হয়ে আমাকে খুন করতে পারবি? দুনিয়াশুদ্ধ লোকে বল্‌বে হরগোবিন্দ চৌধুরীর মেয়ে চোরের, লম্পটের —না, না, তার আগে আমি এ জীবন শেষ ক'রে ফেল্‌ব।

ব'ল্‌তে ব'ল্‌তে হরগোবিন্দ আলমারি খুলে রিভল্‌বার বার করলেন।

তরুবালা আতঙ্কে চিৎকার ক'রে উঠ্‌ল—বাবা!

হরগোবিন্দ নিবিষ্ট মনে রিভল্‌বার পরীক্ষা করছেন, কোনো সাড়া দিলেন না।

তরুবালা পাগলের যত ছুটে এসে হরগোবিন্দকে পিছন থেকে জড়িয়ে ধরল—বাবা, বাবা, তুমি যা বলবে তাই করব আমি। দোহাই তোমার সর্বনাশ ক'র না—মাকে এভাবে শাস্তি দিয়ো না, তিনি ত কোনো অন্যায় করেন নি।

উত্তেজনায়, আবেগে হরগোবিন্দ থরথর ক'রে কাঁপছেন। রিভল্‌বারটা তাঁর কম্পিত মুষ্টি থেকে মেঝের ওপর পড়ে গেল। তরুবালা সেটা কুড়িয়ে নিতেই হরগোবিন্দ মেয়ের হাত থেকে সেটা

কেড়ে নিয়ে বললেন—জানি রে, তুই যতোই যাকে ভালোবাসিস্‌ না কেন এই বুড়ো বাপের কাছে কেউ নয়। তা হলে তুই শুনবি আমার কথা—

তরুবালা মাথা নত ক'রে বলে—হ্যাঁ বাবা!

—তবে শোন, আমার সঙ্গে চল্‌। সবার সামনে বলে দে যে, ওকে তুই চিনিস না।

—তাহলে আর কোনো হাঙ্গামাই থাকে না, না বাবা?

—না মা!

- চলো।

—চলো মা! চৌধুরী বাড়ির মেয়ে তুমি। তোমার আভিজাত্য; তোমার শিক্ষা, তোমার ধর্ম, সে ত সামান্য ছেলেখেলার খেল্‌না নয় মা!

একবার আগ্নেয়াস্ত্রটির দিকে উৎসুক দৃষ্টিতে তাকিয়ে তরুবালা তীক্ষ্ণ শ্লেষের হাসি হাসলো। হাসতে হাসতে বললে—তাই বটে বাবা! চৌধুরী বাড়ির মেয়ে হয়েই যখন আমার জন্ম, তখন আর মানুষ হয়ে কাজ কি!

হরগোবিন্দ যেন সে কথা শুনতেই পাননি এমনি ভাবে রিভলবারটা আলমারিতে বন্ধ ক'রে চাবি লাগিয়ে দিলেন।

॥ তেইশ ॥

জগদীশ হাজত বাস করে। এই তার যথাযোগ্য স্থান। হ্যাঁ, তা বই কি। সে যে চোর। তার বিরুদ্ধে অভিযোগের শেষ নেই। বেআইনী মাদকদ্রব্য চালানকারী, লম্পট দাগী আসামী জগদীশ চক্রবর্তীকে না চেনে কে? তার বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ অভিযোগ অবশ্য—একটি সম্ভ্রান্ত পরিবারের বিবাহ বাসরে মুক্তোর নেক্‌লেশ চুরি করতে গিয়ে সে হাতেনাতে ধরা পড়ে। সাক্ষীর অভাব হয় নি। দেশকর্মী রঘুনাথ, মুটুময়রা, সার্কাসের সেই লছ্‌মী মেয়েটি যাকে জগদীশ একশ টাকা দিয়ে অপমানের হাত থেকে বাঁচিয়েছিল—এরা সবাই জগদীশের বিরুদ্ধে সাক্ষী দিয়েছে তার জঘন্য জীবন বৃত্তান্ত এদের কারুর অবিদিত নয়। আর হরগোবিন্দ চৌধুরীর বাড়িতে চুরি—তার প্রমাণ ত ওই মুক্তোর নেক্‌লেশটাই যথেষ্ট।

ভারতীয় দণ্ডবিবিধির একাধিক ধারায় অলঙ্কৃত জগদীশ চক্রবর্তীর বিচারের রায়। আসামী নিজের স্বপক্ষে একটি কথাও বলে নি। বলবার তার আর কি আছে? নীরবে সব অভিযোগ শুনেছে—কিম্বা শোনে নি।

বিচারে তার পাঁচ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড হয়ে গেল।

জগদীশ আপন মনে হাসে—মাত্র পাঁচ বছর? এর পর বাইরে বেরিয়ে সে কি করবে? এরা কেন সারা জীবনটাই জগদীশের নিয়ে নিল না! এখন তার নিজের কাছে এই জীবনটার কোনোই মূল্য নেই। কি করবে সে এত বড় নিষ্ফল, ব্যর্থতার ইতিহাসটুকু নিয়ে!

কারাপ্রাচীরের অন্ধ গহ্বরে নম্বরী আসামী জগদীশ চক্রবর্তী। কিন্তু তার জীবন ত অনেক আগেই শেষ হয়ে গেছে! তরুবালা তাকে অস্বীকার করেছে। দুনিয়ার হাজারো লোকের সামনে দাঁড়িয়ে স্পষ্ট বলে দিয়েছে—'চিনি না।' সামান্য পরিচয়টুকু স্বীকার ক'রেও কণামাত্র মর্যাদা দিতে পারল না তরুবালা! অথচ দিনের পর দিন সেই আকুতিভরা দৃষ্টি নিয়ে হাসপাতালে রোগশয্যায় পাশে ব'সে জগদীশকে মৃত্যুর দরজা থেকে ফিরিয়ে এনেছে এই তরুবালাই। এটা কি ক'রে সম্ভবপর হয়!...তরুবালা কি জগদীশের দুটি হাত ধরে বলেনি—তুমি উঠে এসো। তুমি নইলে আমার জীবন ব্যর্থ হয়ে যাবে!

কি জানি হয়তো সমস্তটাই এক বিরাট স্বপ্নবিলাস। আসলে হয়তো এসব কিছুই বাস্তবে ঘটে নি। জগদীশ দিবাস্বপ্নের ঘোরে কল্পনায় ঘটতে দেখেছিল।

হ্যাঁ, সেটাই ভাবা যাক। তাতে যন্ত্রণা অনেক কম। তাতে জগদীশের চোখে তরুবালাকে হীন হ'তে হয় না, তাতে তরুবালাকে

নোংরায় নামতে হয়। তাই হোক। তাতে অনেক বেশি সান্ত্বনা পায় জগদীশ।

হঠাৎ গালিগালাজ শুনে জগদীশ ধড়ফড়িয়ে উঠে বসল। মেট এসেছে, সে তার স্বভাবসুলভ প্রভুত্বব্যঞ্জক কণ্ঠে বল্‌ছে—ইয়ে শ্বশুরার নেহি হ্যায়। উল্লু ঔর কুত্তালোগ জল্‌দি নিকাল্‌, আভি গিন্‌তি মিলান্ হোগা। লম্বর লাগাও গাধ্বে কে বাচ্চে।

তীব্র কঠিন হাসিতে জগদীশের দাড়িভরা মুখখানা ভরে' যায়, নিজেকে সে বলে—চল জগদীশ চক্রবর্তী, গাধার বাচ্চা! তোমাকে এখন লপ্‌সীর রাজভোগ খেতে হবে।

মনে মনে আজকাল সে নিজেকে খুব বিদ্রূপের চাবুক কষিয়ে দেয়। একান্তে যখন বিনিদ্র দুচোখ কেবল অন্ধকার পান করে তখন সে ঠাট্টা ক'রে বলে—প্রেম! সোনার পাথর বাটী! পাথরের কান্না! প্রেমের চেয়ে পেঁয়াজের খোসাতে অনেক বেশি ভালোবাসার রং মাখানো রয়েছে। হা-হা-হাঃ—

চম্‌কে ওঠে জগদীশ নিজের অট্টহাস্যে।

একই মানুষ একই দৃশ্য স্মরণ ক'রে কখনো হাসে কখনো কাঁদে!

জগদীশের চোখের সাম্‌নে ভেসে ওঠে আলোকমালাসজ্জিত উৎসব কলরব মুখরিত, আতর-গোলাপজল সুরভিত একটি অপূর্ব সান্ধ্য পরিবেশ। একতলা, দোতলার সিঁড়ি·· উৎসুক অধীরপদপাতী এক যুবক,···অসংখ্য লোকজনের ভিড়···গালিগালাজ কিলচড় লাথি···তবু একটা আশার মুখ চেয়ে সমস্ত আঘাত-অপমান সয়ে যুবক ব'লে, তরুবালা আমাকে চেনে, সে আমার বন্ধু, তার জন্তে এই মালা···আহা কী অপূর্ব সাজে সেজেছে তরুবালা, রাজেন্দ্রানীর

বেশ ·· জগদীশের তৃষিত দু-চোখে ব্যাকুল আগ্রহ···কথা সে কইতে পারে না ·· এই সেই তরুবালা! হ্যাঁ সে-ই বটে, আবার যেন মনে হয় এ যেন সেই তরুবালা! হরগোবিন্দর বজ্রগম্ভীর প্রশ্ন—একে তুমি চেনো?···পরক্ষণে সব যেন অন্ধকারে তলিয়ে যায়। তরুবালার ঠোঁট নড়েছিল কি না জগদীশ ত্মাখে নি, সে শুধু ওর চোখের দিকে তাকাতে গিয়ে কি মনে ক'রে চোখ নামিয়ে নিয়েছিল।···না! না না—

তারপর আর বাকী থাকে কি? কিছুই না।

বিচারের আগেও এই ভাবেই নিজের মধ্যে থেকে দুটো মানুষের ঝগড়া নিয়ে জগদীশের দিন কেটেছে।

বিচারের পরের দিনটাও সেইভাবেই শুরু হয়েছিল। তফাতের মধ্যে এই হয়েছে যে,—মাত্র পাঁচ বছরের মেয়াদে জগদীশ বিরক্ত হয়েছে। এ বিরক্তি কতকটা নিজের উপরই। ভাগ্য এখানেও চক্রান্ত ক'রেছে, সামান্য পাঁচটা বছর জেলখানায় থাকার ব্যবস্থা। অথচ অদৃষ্টের পরিহাসে তাকে বাকী জীবনটাও অভিশাপ বয়ে নিয়ে বেড়াতে হবে,—মুক্তির অভিশাপ, দুর্বহ জীবনের অসমাপ্তির অভিশাপ!

খবর এল, জগদীশের দর্শনার্থিনী এক তরুণী!

কে?

পিছন থেকে জমাদার সাহেব রসিকতা করে অশ্লীল ভঙ্গীতে। জগদীশের কান মাথা ঝা-ঝা করে। ইচ্ছে করে এই লোকটার

গলা টিপে এক মুহূর্তে শেষ ক'রে দেয়। কিন্তু জেলখানা, এখানে ইচ্ছার পায়ে শেকলটা সব আগে পরিয়ে দেয় অদৃশ্য কর্তৃপক্ষ।

তরুবালা চোখভরা জল নিয়ে জগদীশের দিকে তাকিয়ে বলে—জগদীশ! জগদীশ! তোমার বিচার হয় নি। অবিচার হয়েছে। আমি তোমার পক্ষ নিয়ে বড় আদালতে আপীল করব। না, না, আমার জন্যে তোমার এত বড় অপমান কিছুতেই হ'তে দেব না। এই যে, এই দরখাস্তে তুমি একটা সই ক'রে দাও। বিশ্বাস করো জগদীশ, আমি সব কথা স্বীকার করব।

শূন্য দৃষ্টিতে জগদীশ তাকিয়ে থাকে। তরুবালার চোখের দৃষ্টির সঙ্গে সে আর নিজের দৃষ্টিকে মিল্‌তে দেবে না। কিছুতেই না। তবু একবার তার দৃষ্টি গরাদ ডিঙিয়ে, কড়িকাঠ থেকে নেমে আসে—তরুবালার চোখের সাম্‌নে নয়, ওর সিঁদুর দেওয়া উজ্জ্বল রাঙা সিঁথির সামনে। হ্যাঁ নিমেষকাল জগদীশের বিষণ্ণ নির্ব্যক্ত দৃষ্টি ওই সিঁথির উপর স্থির হয়ে দাঁড়ায়।

সাগ্রহে তরুবালা নিজের হাতের কাগজখানা এগিয়ে দেয়।

জগদীশ কথাও বলে না।

জগদীশ আর তরুবালার মাঝখানে রয়েছে জেলখানার একজন রাইটার।

তরুবালা অধীর আগ্রহে ডাকে—জগদীশ! জগদীশ! শোনো।

অন্যদিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে জগদীশ নীরসভাবে জবাব দেয়—কে জগদীশ! সে নেই! আমি ৩১৫৭ নম্বর আসামী!

মিনতি করুণ সুরে তরুবালা বলে—আমি তোমাকে চিনি, তুমি জগদীশ।

—মিথ্যে কথা! আমি জগদীশ নই। আমি তোমাকে চিনি না।

রাইটার তার কেতাদুরস্ত ভঙ্গীতে প্রশ্ন করে—আপনার আর কিছু বলবার আছে?

অশ্রুময়ী তরুবালা অসহায়ভাবে দাঁড়িয়ে থাকে।

জগদীশ রাইটারকে গম্ভীরভাবে বলে—আপনারা আমাকে কেন এভাবে বিরক্ত করেন, মশাই? যার তার সামনে হাজির ক'রে মিছে হয়রান ক'রে কিছু লাভ আছে?

উদ্গত-অশ্রু দমন ক'রে তরুবালা শেষবারের মতো প্রার্থনার আবেগে বলে—জগদীশ, আমি তোমার কাছে ক্ষমা চাইতে আসি নি। শুধু তোমার প্রতি অযথা অন্যায় যাতে রহিত হয়, সেটুকু করবার অধিকার আমাকে দাও, দোহাই তোমার।

জগদীশ মাথা নেড়ে রাইটারকে বললে—আমায় চলে যাবার অনুমতি দিন স্যর! আর ওঁকে বলে দিন, আমার চরম বিচার করেছেন সুযোগ্য বিচারক। তাঁর বিরুদ্ধে আমার কোনো অভিযোগ নেই।

রাইটার একটু হেসে তরুবালাকে বললে—সবই ত শুনলেন। এরপর আমাদের আর কিছু করার নেই।

তরুবালার চোখের সামনে থেকে জগদীশ চলে গেল জমাদারের সঙ্গে।

না, জগদীশ তাকে চেনে না।

হ্যাঁ জগদীশের বিচার হয়ে গেছে।

কিন্তু বাকী ছিল তরুবালার বিচার। আজ জগদীশ নিজের

হাতে সেটুকু ক'রে দিয়ে বিদায় নিয়েছে কারাপ্রাচীরের অন্তরালে।

শূন্য অবসন্ন তরুবালা বাইরে বেরিয়ে এল। ওর চোখের সাম্‌নে এক উজ্জ্বল অপরাহ্ণের ছবি। তরুণ সুকুমারকান্তি যুবকের ওষ্ঠে জ্বলন্ত সিগারেট। সিগারেটের আগুনে জামাটা পুড়ল। কিন্তু সে আগুনের ছোঁয়াচ ভয়ানক। একটা অসতর্ক জীবনে সেই আগুনের ফিন্‌কি উড়ে এসেছিল অলক্ষ্যে। তুঁষের আগুনের মতো সেটা ভিতরে-ভিতরে ধিকি ধিকি জ্বলবে। চোখে দেখা যাবে না, অন্তরে অন্তরে খাক হবে।

তরুবালা আঁচল দিয়ে তার রুদ্ধ কান্না চেপে বাইরে চ'লে গেল!—

———

MAHARAJA BIR BIKRAM COLLEGE
LIBRARY.
Agartala.